ISSN-2249-5207

# আকাদেমি পত্রিকা

২০১১

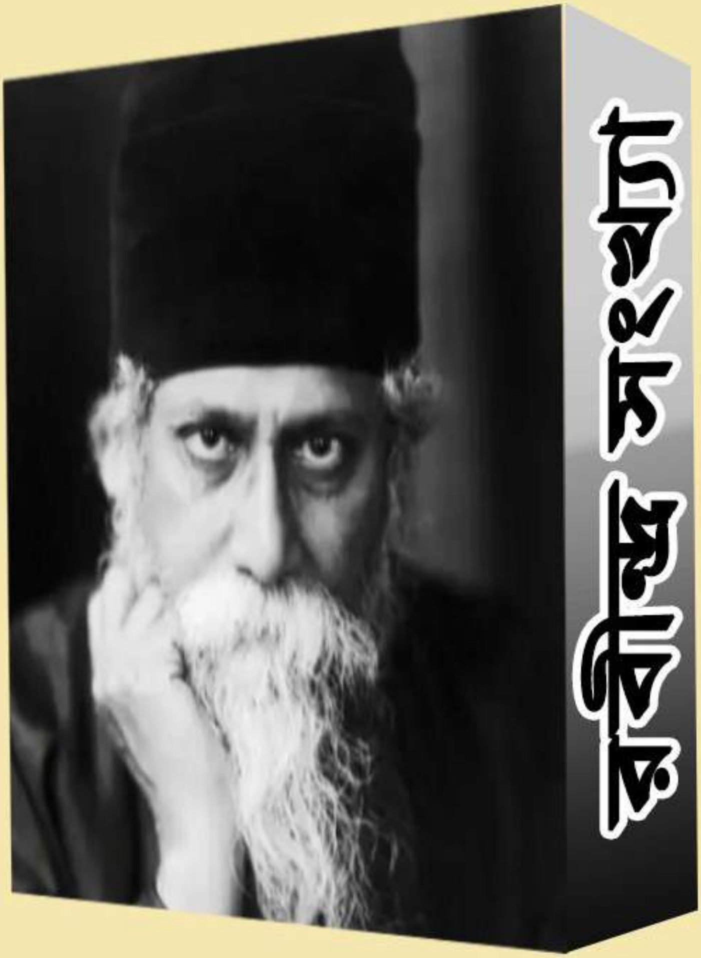

ভাষা আকাদেমি

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

# আকাদেমি পত্রিকা

২০১০-২০১১

সম্পাদক
**সঞ্জীব দেবলস্কর**

**ভাষা আকাদেমি**
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় সমিতি, শিলচর, আসাম

# আকাদেমি পত্রিকা

## AKADAMI PATRIKA

*A Research Joumal of the Bhasha Akademi (in Bengali) under the aegis of Barak Upatyaka Banga Sahitya-O-Sanskriti Sammelan, Silchar, Assam published by Tarun Das, General Secretary, edited by Sanjib Deblaskar, Convenor, Editorial Board, Vol. IV, No. 4*

*© Barak Upatyaka Banga Sahitya-O-Sanskriti Sammelan, Silchar, Assam*

₹ 100/-

**ISSN 2249-5207**

**সম্পাদনা সমিতি**

**আবুল হোসেন মজুমদার, জন্মজিৎ রায়, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি নাথ, সঞ্জীব দেবলস্কর, (আহ্বায়ক)**

**প্রকাশ : ২০১১ আগস্ট # ১৪১৮ শ্রাবণ**

**© বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কেন্দ্রীয় সমিতি।**

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :** **অক্ষর বিন্যাস :** সর্বাণী ভট্টাচার্য

**মুদ্রণ :** শিলচর সানগ্রাফিক্স, উল্লাসকর দত্ত সরণি, শিলচর - ৭৮৮০০১

**প্রকাশক :** বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন পরিচালিত 'ভাষা আকাদেমি'র পক্ষে কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ দাস কর্তৃক প্রকাশিত, আকাদেমি পত্রিকার আহ্বায়ক সঞ্জীব দেবলস্কর কর্তৃক সম্পাদিত এবং শিলচর সানগ্রাফিক্স, প্রেমতলা, শিলচর-৭৮৮০০১ এর পক্ষে পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

**মূল্য :** ১০০ টাকা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের। প্রকাশক, সম্পাদক কিংবা সম্পাদকমণ্ডলী এর জন্য দায়ী নন।
অনুমতি ব্যতিরেকে এই পত্রিকার কোন লেখা বা রচনার কোন অংশবিশেষ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

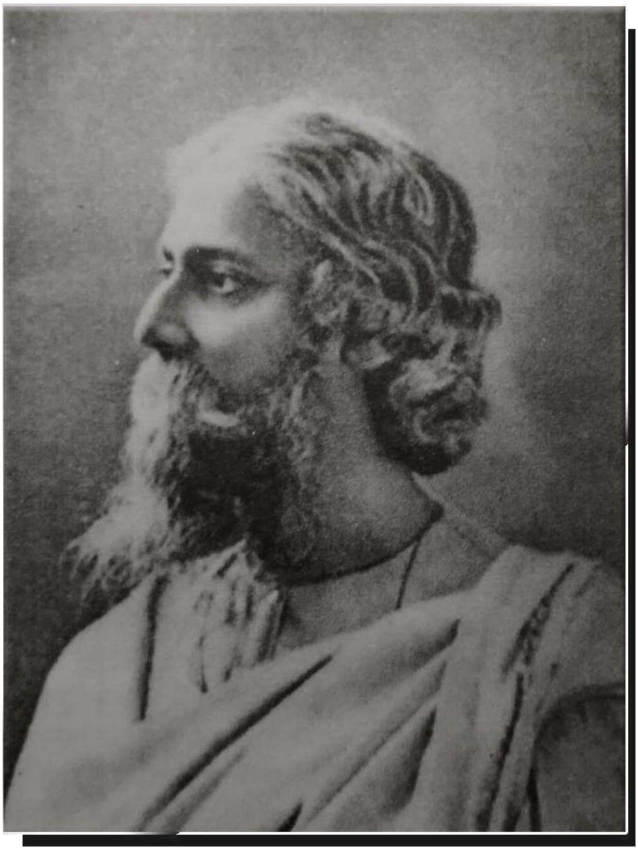

যতই ছাড়াতে চাই আষ্টে পৃষ্ঠে ততো বাঁধে জট
এ কেমন মায়া তব, গুল্মকুলে হে প্রবুদ্ধ বট !

—শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

**বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন**
**কেন্দ্রীয় সমিতি**
দূরভাষ ৯১-৯৪৩৫৩৭৮৬৫৭
Email: bangasahityahkd@Gmail.com
nitishchbhattacharjee@Gmail.com

## *মুখবন্ধ*

রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজয়ন্তীশতবর্ষে একাদশ শহিদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হয়েছে। সে ছিল মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন। বৃহত্তর বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বরাক উপত্যকায় রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাস অনেক দিনের। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের নেতৃত্বে এ উপত্যকায় রবীন্দ্রচর্চা শুরু হয়, যার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যামান। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন রবীন্দ্র সার্ধজন্মশতবর্ষে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় ও মননে যে নানা রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত হয়েছেন তা'ই সংকলন করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্মেলনের উদ্যোগে ইতিপূর্বে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ উপত্যকার ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য, ইতিহাস এবং অন্যান্য কলাকৃতির চর্চাকে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবার লক্ষে একটি 'ভাষা আকাদেমি' স্থাপন করেছে। ইতিপূর্বে সম্মেলন-প্রকাশিত গবেষণা পর্ষদ পত্রিকা বর্তমান সংখ্যা থেকে আকাদেমি পত্রিকা রূপে প্রকাশ করা হল। এবারের এ পত্রিকাটি কবিগুরুর সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ 'রবীন্দ্র সংখ্যা' হিসেবে হল। সম্মেলন বরাক উপত্যকার ভাষা সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন প্রতিরোধের পাশাপাশি শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ এবং মননশীলতার প্রতি দায়বদ্ধ। আকাদেমি পত্রিকার এই বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় রবীন্দ্র বিষয়ে একান্তভাবে আমাদের এ অঞ্চলের চিন্তাচর্চার ফসল তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সংখাটি বরাক উপত্যকা তথা উত্তর-পূর্বে রবীন্দ্রচর্চার নির্দশন হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে। আশাকরি আমাদের এ প্রয়াস সুধী মহলে আদৃত হবে।

বিশিষ্ট লেখক যারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বরাক উপত্যকা তথা উত্তরপূর্বাচলের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন এদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। রবীন্দ্রমানস ভুবনে আমাদের অবস্থান যে কোনও কষ্টকল্পিত বিষয় নয়, আশাকরি এ পত্রিকা পাঠ করে পাঠকেরা তা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। সুখে দুঃখে সংকটে উল্লাসে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরসঙ্গী, এ বোধ আমাদের ভাষিক এবং সাংস্কৃতি অস্তিত্বকে আরও দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে, এ আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে ভাষা আকাদেমির এ পত্রিকা আগামী দিনের জন্য আশার সঞ্চার করুক, এ কামনা জানাই।

হাইলাকান্দি
২০ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

সভাপতি

**বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন**
**কেন্দ্রীয় সমিতি**
দূরভাষ ৯১- ৯৪৩৫৩৭৩৯৮৮
Email: bsahitya2010@Gmail.com

## *প্রাক্-কথন*

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের গবেষণা পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল এই অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা-শিক্ষা-অর্থনীতি- ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক গবেষণাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য। ইতিপূর্বে পর্ষদের উদ্যোগে 'গবেষণা পর্ষদ পত্রিকা'-র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং গবেষণা পর্ষদ যে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে, এ সম্পর্কে দ্বিমত-দ্বিরুক্তির অবকাশ নেই। পর্যদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব থাকলেও মানব-সম্পদের অভাব নেই। এই অঞ্চলের প্রবীণ-নবীন প্রবাসী-স্থানীয় একাধিক গবেষকের কাছ থেকে পর্ষদ অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের অন্তহীন ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার্য। আর্থিক প্রতিকূলতা জন্মলগ্ন থেকেই গবেষণা পর্ষদের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। বর্তমানে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের জন্য রাজ্য সরকারের এককালীন বার্ষিক অনুদান পর্যদের কাজকর্ম ও প্রকাশনার পথকে নিষ্কণ্টক করতে সহায়ক হয়েছে।

গবেষণা পর্যদ্ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যারূপে পরিকল্পিত। এ সঙ্গে এখন থেকে পত্রিকাটি 'আকাদেমি পত্রিকা', ভাষা আকাদেমি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, হিসেবে প্রকাশিত হবে। এ নিয়ে আগামীতে বিশদ তথ্য জ্ঞাপন করা হবে, জানানো হবে আগামী কার্যসূচিও।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শিলং থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে শ্রীহট্টে আসেন এবং মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্রাবাসে ৭ নভেম্বর, ১৯১৯ (২১ কার্তিক, ১৩২৬) প্রায় এক ঘণ্টাকাল দীর্ঘ ভাষণ দেন ছাত্রদের সম্বোধন করে। শ্রীহট্ট নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে' সম্ভবত এই সময়কার রচনা। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার উপেন্দ্রকুমার কর (১৮৭৭-১৯৫৫) ১৯১৪ সালে 'গীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতিবাদ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেটা গীতাঞ্জলি-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ বলে সুধীবর্গ মনে করেন। সেকালের সুরমা উপত্যকা তথা আসামের বিশিষ্ট পন্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩২৪ সনে (১৯১৭) 'উপাসনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই অঞ্চল থেকে সেকালে শান্তিনিকেতনে যাঁরা গিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই অঞ্চলের যে-সকল সুধী পন্ডিত রবীন্দ্র গবেষণা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হচ্ছেন সতীশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, অশোকবিজয় রাহা, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভূদেব চৌধুরী, অমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ। রবীন্দ্র-চর্চায় সেকালের সুরমা উপত্যকা বা বর্তমান বরাক উপত্যকা পিছিয়ে ছিল না, আজকেও পিছিয়ে নেই। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করেই নবীন প্রজন্মকে রবীন্দ্র-চর্চায় অগ্রসর হতে হবে।

বর্তমান প্রকাশনাকে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবাইকে এবং বিশেষ করে, লেখকবর্গকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সম্পাদনা সমিতির সদস্য ও আহ্বায়ক তথা সম্পাদককেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠক মহলে বর্তমান সংখ্যাটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি। ইতি।

২৫ বৈশাখ, ১৪১৮

সাধারণ সম্পাদক

# সম্পাদকীয়...

কবিগুরুর সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আকাদেমি পত্রিকার বিশেষ 'রবীন্দ্র সংখ্যা'র সম্পাদক মণ্ডলী প্রথম যে প্রস্তাবিত সূচিপত্র তৈরি করেন, সে অনুযায়ী কাজে নেমে বোঝা গেল এ সুচিতে স্থিত হওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এ বিশেষ উপলক্ষে কবিকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। 'সাহিত্য অকাদেমি' (নতুন দিল্লি), 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' (কলিকাতা), 'বাংলা একাডেমী' (বাংলাদেশ) এবং সর্বোপরি শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীতে যে মানের গবেষণা হবে বরাক উপত্যকায় সীমিত পরিসরে কি এদের সমধর্মী গবেষণা সম্ভব, এ প্রশ্ন আমাদের সততই পীড়িত করেছে। ব্যয়বহুল একটা প্রকাশনাতে যদি এখান থেকে ওখান থেকে কথা, আর কথার পিঠে কথা, উদ্ধৃতির পিঠে উদ্ধৃতি জোড়া দিয়ে কিছু রচনার সমাবেশ ঘটানো হয়, এতে কী'ই বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে! সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এরকম তো অসংখ্য প্রকাশনা চলছেই। এরকম কাজ করে আরও কিছু অক্ষরকে মুদ্রাযন্ত্রে পিষ্ট করলে না হবে প্রকৃত রবীন্দ্র অনুধ্যান, না হবে কবির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

আমরা তাই রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রজীবনী নিয়ে কোন গবেষণার দুরূহ পথে না গিয়ে আমাদের এ ভুবনে, অর্থাৎ বাংলা ভাষার অপর ভুবনে, তদানীন্তন শ্রীহট্ট-কাছাড় বা সুরমা বরাক, আজকের দিনের বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নের প্রয়াস নিই। কবিগুরুর মানসভুবন যে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বময় ছড়ানো, এটাতো সর্বজনবিদিত। তাঁর মানসভুবনে ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলা দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট ছোট্ট পৃথিবীগুলোও অপাঙক্তেয় ছিল না। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চটি বাঙালির একটি সাংস্কৃতিক ইউনিট হিসেবে তাঁর মনোজগতে বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত ছিল। বাংলার রাষ্ট্রসীমার একেবারে প্রান্তবর্তী এ অঞ্চলটির প্রকৃত স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এখানকার নির্বাসিত অবস্থা তাঁকে পীড়িত করেছিল। তিনি যে এ ভূমির নাম দিয়েছিলেন 'সুন্দরী শ্রীভূমি' সে তো আর অমনি অমনি নয়। তিনি এখানকার লোকায়ত দর্শন, নৃত্যকলা, গ্রামীণ সাহিত্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন অনায়াস দক্ষতায়, বঙ্গভূমির কেন্দ্রীয় স্থলের সঙ্গে এ ভূমির যে সারস্বত সম্পর্ক রয়েছে, এ ছিল তাঁর আন্তরিক উপলব্ধি। বহু উদ্ধৃত তাঁর 'সুন্দরী শ্রীভূমি' কবিতার একটি শব্দ কিম্বা একটি ছত্রও নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়, এটা আমরা নানা ঘাত প্রতিঘাতর মধ্যদিয়ে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছি। কবি এদিকে এসেছেন মাত্র একবারই, কিন্তু নানা অনুষঙ্গে, নানা প্রসঙ্গে, নানা ঘটনায় আমাদের এ ভুবনটি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। একটি ছড়ায়, কিম্বা দুটো চিঠিতে বা একটি উপন্যাসে 'শিলচর' স্থাননামটি উল্লেখ পেল কি না, সেটা খুব একটা ব্যাপার নয়। আসল হল, কবিগুরুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে এসে এখানকার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর

সম্পদ যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এটা তো কেউ ভাবেনি। মরমিয়া কবি হাছনরাজার পদ, মণিপুরী নৃত্যকলা, কমলালেবুর গন্ধ মুখে লেগে থাকা বালকটি, যে পরবর্তীতে হয়ে ওঠে খ্যাতনামা ভাষা বিশেষজ্ঞ, ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত, সুরসিক কথাকার-এরই মধ্যে আমরা এ ভুবনে বিশ্বকবিকে খুঁজে পাই। হাছনরাজা গেয়েছিলেন, ‘রূপ দেখিলাম রে, আপনার রূপ দেখিলাম রে, আমার মাঝে আমার হইয়া দেখা দিল রে’। আমাদের এ ভুবনে কবিগুরুরও যেন এই একই উপলব্ধি।

আমরা রবীন্দ্রনাথের ঠিক ওই দিকটিই ধরতে চেয়েছিলাম- এখানকার চিন্তা চেতনায়, এখানকার ইতিহাস, সমাজ, শিল্পচেতনায়, এখানকার ধর্মদর্শনে রবীন্দ্রঅনুষঙ্গ। এটাই একটি প্রধান ক্ষেত্র যেখানে আমরা রবীন্দ্রচর্চায় নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখতে পারি। বরাক উপতাকা থেকে বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য আমরা তাই এমনি কয়েকটি একান্ত আঞ্চলিক অনুষঙ্গভিত্তিক বিষয়ের উপর রচনা আহ্বান করেছিলাম। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা লেখা দিয়েছেন এদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

# সূচিপত্র

- মুখবন্ধ
- প্রাক্-কথন
- সম্পাদকীয়
- দু’টি রবীন্দ্র কবিতার জন্মকথা ১
  — উষারঞ্জন ভট্টাচার্য
- মরমিয়াবাদে রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজা ৫
  — আবুল হোসেন মজুমদার
- চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ ১৮
  — জন্মজিৎ রায়
- বরাক উপত্যকায় রবীন্দ্র নির্মাণ : সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রকাব্য ২৮
  — আনন্দমোহন মোহন্ত
- আমাদের রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্যের চারণক্ষেত্রে কবিগুরু ৩৫
  — তুষারকান্তি নাথ
- রবীন্দ্র-আলোকে সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাস-চেতনা ৩৯
  — সঞ্জীব দেবলস্কর
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঠাকুরপরিবার: প্রাক্ রবীন্দ্র থেকে রবীন্দ্রোত্তর পর্ব : ইতিহাসের সূত্রসংকেত ৪৩
  — বিবেকানন্দ মোহন্ত
- শিলচর শহরে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা ৫১
  — দেবাশিস দাস
- ঢাকাদক্ষিণে সপ্ততিতম রবীন্দ্রজয়ন্তী, ১৯৩১ ৬২
  — বাণীপ্রসন্ন মিশ্র
- শিলচরে রবীন্দ্রঅনুষ্ঠান: সংক্ষিপ্ত সমীক্ষণ ৭৫
  — ড. মনুজেন্দ্র শ্যাম
- করিমগঞ্জে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর প্রতিবেদন ৮৪
  — অরিজিৎ চৌধুরী
- গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী : প্রতিবেদন ১ ৮৮
  — দীপকের চন্দ
- গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ : প্রতিবেদন ২ ৯০
  — সঞ্জীব দেবলস্কর
- আকাদেমি পত্রিকা — গত চারটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি ৯২
- চিত্র
- প্রসঙ্গ ভাষা আকাদেমি

# দু’টি রবীন্দ্র কবিতার জন্মকথা

## উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

কলকাতার একটি বাংলা কাগজে ১৯ মার্চ ২০১১ চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। আলাপচারিতে একটি প্রশ্ন ছিল ‘ঠাকুর পরিবারের মেয়ে বলেই কি রবীন্দ্রনাথের প্রতি এত আগ্রহ?’ শর্মিলা বলেছিলেন :

> কিছুটা তো বটেই। আমার মা শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েছিলেন। মাকে রবীন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করতেন। মায়ের দুই বিনুনি নিয়ে উনি একটি কবিতা লিখেছেন। আমার নাম শর্মিলাও এসেছে ওঁর উপন্যাস ‘দুই বোন’ থেকে। মায়ের মুখে শান্তিনিকেতনের অনেক গল্প শুনেছি। মায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি এখনও আছে। উনি বসে আছেন, মা পিছনে দাঁড়িয়ে। সেটা অবশ্য সোহার* কাছে থাকে।

উত্তরটা পড়ে বেশ মজা পেয়েছিলাম। মজা ১. ‘মায়ের দুই বিনুনি নিয়ে উনি একটি কবিতা লিখেছিলেন।’ এর চেয়ে বেশি শর্মিলা আর কিছু বলেন নি। কবিতাটি শুধু বিনুনি নিয়েই নয়, ইরা ঠাকুরের খোঁপা নিয়েও। মনে হয় শর্মিলা জানেন না ইরাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতাও আছে — সেখানে রবীন্দ্রনাথ ইরাকে বলেছেন ‘তুমি কমল হীরা’। মজা ২. ইরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবির কথা বলেছেন শর্মিলা। আসলে ছবি একটি নয়, তিনটি— সবগুলিরই প্রতিলিপি আছে আমাদের কাছে।

বিনুনির কবিতার উৎস-অনুসন্ধানে যেতে হবে এবার। সেখানেও মজা আছে। শুনুন :

দিনটি ছিল ১০ জুলাই ২০০২ সন, বুধবার। জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া ও লতিকা ঠাকুরের কন্যা ইরা ঠাকুর (বরুয়া)কে না পেলেই নয়, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার নেপথ্য-বার্তা ধরা দিতে যাচ্ছে বোধ হয়; ইরাকে না পেলে সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। রবীন্দ্র-কবিতির জন্মকথা নিয়ে বর্ষীয়ান গবেষক গোপালচন্দ্র রায় নিরলস চিন্তা-চর্চা ও পরিশ্রম করেছেন, অস্বস্তির নিরসন ঘটাতে চলে গেলাম তাঁর মদন বড়াল লেনের বাড়িতে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে বারিদবরণ ঘোষ মশাই গোপালবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। অতিথিপরায়ণ এবং আলাপী এই প্রবীণের সঙ্গে আলোচনায় কোনো ফল হল না। একেবারে ফল হল না বললে ভুল হবে, আমার অনুমানে সায় দিলেন গোপালবাবু। এখন দরকার ইরা ঠাকুরকে। কিন্তু ইরা কি কলকাতায় আছেন? বাঙ্গালোর বা দিল্লি চলে যান নি তো? ইরা ঠাকুরের কাছে যাবার দরকার অন্য কারণেও অসমিয়া ভাষায় লেখা আমার ‘রবীন্দ্রনাথ আরু অসম’ বইটি উপহার দিতে হবে। একে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় গুণদাভিরাম বরুয়ার নাতনি, জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার কন্যা, স্বর্ণলতা দেবীর ভাইঝি, তায় বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছিলেন আমাকে।

---

* পুরো নাম সোহা আলি খান, শর্মিলা ঠাকুরের বড় মেয়ে

সৌভাগ্য আমার, নিউ আলিপুরের 'নীহারিকা' ফ্ল্যাটে গিয়ে পেয়ে গেলাম তাঁকে। বই পেয়ে দারুণ খুশি তিনি। আমিও খুশি নদীর ঘাটে পৌঁছে গেছি বলে। আচমকা প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ে আমার মুখ থেকে —

—এলাহাবাদে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার দেখা হয় তখন কি আপনি লম্বা বিনুনি বাঁধতেন?

এ কী প্রশ্ন। প্রশ্নটা নিজের কানে শুনে নিজেই লজ্জিত হই। এভাবে প্রশ্ন করা কি সংগত হলো?

বই থেকে ক্ষণেকের তরে মুখ তুলে তাকালেন, স্মিত হাসিতে পাল্টা প্রশ্ন করলেন — আপনার কি মনে হয়—বাঁধতাম। আপনার তো তখন জন্মই হয় নি।

একটু ভরসা পেয়ে বলি— আমার জন্ম হয় নি বটে, কিন্তু ক্যামেরার চোখ তো মিছে কথা বলে না, রবীন্দ্রনাথ তো মিছে বলেন না।

—ঠিক আছে, লম্বা বেণী বাঁধতাম, কিন্তু সে ছবি আপনি কোথায় পেলেন? —

—আপনাদের গুয়াহাটির বাসায়। আপনার ভাই চিত্তাভিরামের স্ত্রী কাছে।

চন্দ্রবদনা বৃদ্ধার ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে ওঠে। বইয়ের থেকে চোখ তুলে আকাশের চলমান মেঘের দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করতে থাকেন—

প্রয়োগে যেখানে গঙ্গা যমুনা
        মিলায়েছে দুই ধারা
তারি তীরদেশে
সেখানে তোমার দেখেছিনু কী চেহারা
দ্বিবেণী তোমারে নাম দিয়েছিনু
        দুই বেণী সোজাসুজি
পিঠে নেমেছিল অচল ঝরনা বুঝি।
আজি এ কী দেখি খোঁপায় তোমার
        বাঁধিয়া তুলেছ বেণী
চাঁদের সঙ্গ
        চাঁদেরে মাগিয়া জমেছে মেঘের শ্রেণী
এবার তোমার নামের বদল
না করে উপায় নেই,
বলিব
খোঁপা-গরবিনী খোবানি ডাকিব তাই।

আবৃত্তি শেষে উঠে গিয়ে নিয়ে এলেন ফটোর অ্যালবাম। হ্যাঁ, ছবি দুটো অ্যালবামেও রয়েছে। খুশিতে মন ভরে উঠেছে আমার। এই, এইতো বন্ধ দরজা খুলে যাচ্ছে, ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছি।

— দেখলেন তো, ক্যামেরা যে কথা বলেছে ১৯৩৫ সালে কবি সেই কথাই বললেন পাঁচ বছর পর পর ১৯৪০-এ। বই বন্ধ করে অর্ধেক বিস্ময় অর্ধেক জিজ্ঞাসা নিয়ে ইরা তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে।

— আচ্ছা, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে তিন বছর আগে আমি একখানা গ্রুপ ফটো এনে আপনাকে দেখিয়ে বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের পাশে থাকা আপনার বাবাকে আপনি সনাক্ত করুন। ওই গ্রুপ ফটোটি হেমলতা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময়ের আলোচনাসূত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৩—র শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়। মুদ্রিত ছবিটির তলায়, সম্ভবত আলোচক জানতেন না বলেই বাদ পড়েছিল জ্ঞানদাভিরাম, মনোভিরাম এবং আপনি সমেত আটজনের নাম। আপনিই ওই আটজনকে সনাক্ত করেছিলেন, বিশ্বভারতীকে

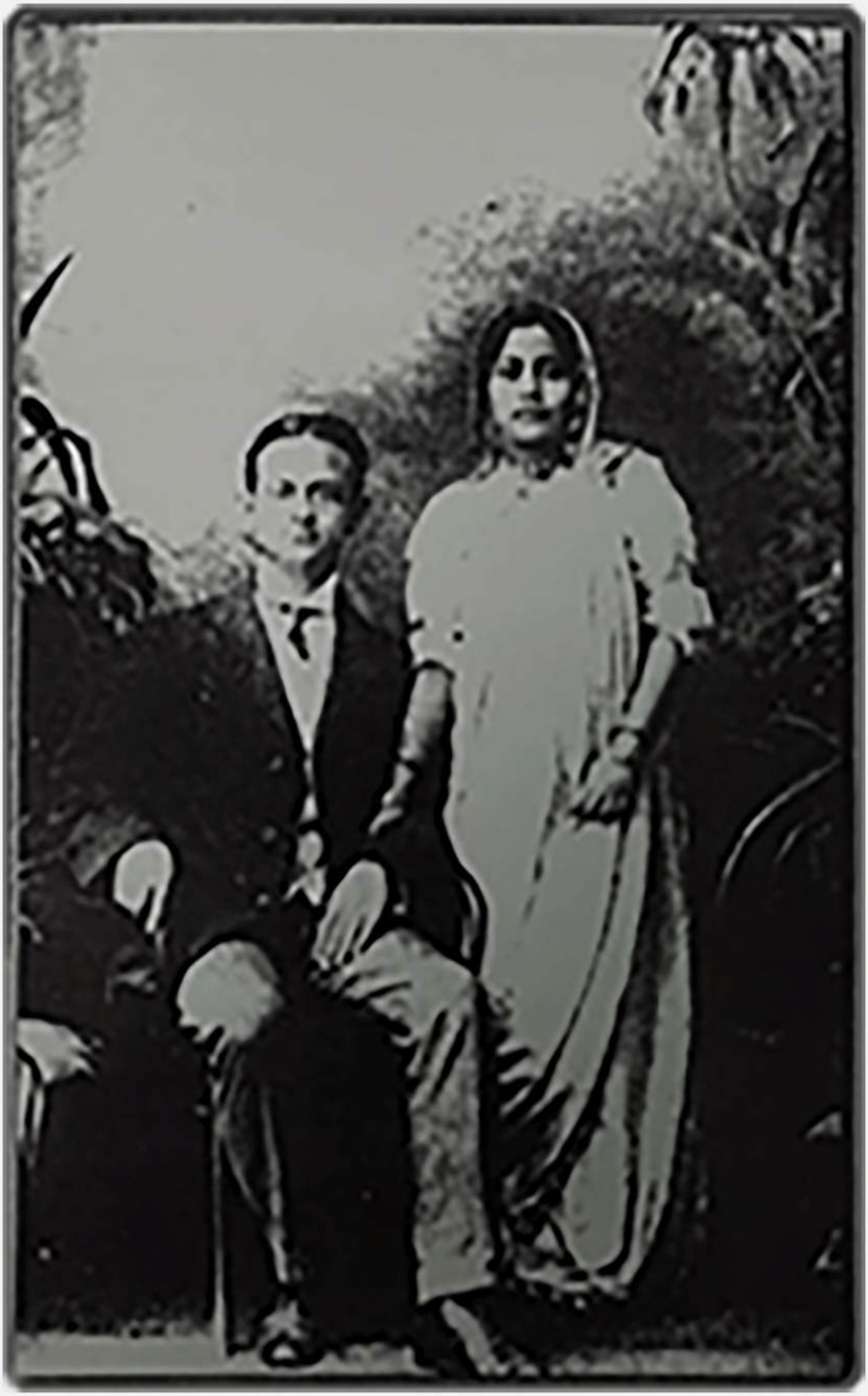

জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া ও লতিকা (ললিতা) দেবী
(বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত চিত্র)

আমি তা জানিয়েছিলাম, এই বইতেই পাবেন সেই ছবিটি। আপনি ছবিটির এক মজার ইতিহাস ব্যক্ত করেছিলেন সেদিন — বলেছিলেন, অজীন মামা (অজীতেন্দ্রনাথ ঠাকুর) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের শেষে এক পারিবারিক গ্রুপ ফটো তুলতে চাইলে রবিদাদা আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেছিলেন —

—ছবিতে আপত্তি নেই, তুই যদি কাছে থাকিস তবে। তোর পিসীকে (স্বর্ণলতা দেবী) তো পেলাম না, তোর সঙ্গেই ছবি তুলি। রবিদাদা পিসীর কথা তুলে বাবার সঙ্গেও ঠাট্টা মস্করা করেন। ফটোগ্রাফার অজীনমামাই ছবির জন্যে জায়গা ঠিক করেছিলেন— শান্তিনিকেতনের ‘দেহলী’ ভবনের সামনাটা।

—ঠিক ঠিক।

—এবার বলি, ‘প্রয়োগে যেখানে গঙ্গা...’ কবিতাটি রবীন্দ্র—রচনাবলী বিশ্বভারতীয় সংস্করণে নেই, এটি আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত (১৪০১ সাল) রবীন্দ্র-রচনাবলীতে। কবিতার নিচে তারিখটা লক্ষ করুন ১৬।৩।৪০ অর্থাৎ আপনার কথিত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের চার দিন পর। আজ তিন দিন হল কবির সঙ্গে আপনার এলাহাবাদে অর্থাৎ প্রয়াগে তোলা ছবিটি চোখে পড়তেই হঠাৎ কবিতাটির পেছনকার বন্ধ দুয়ারে টোকা পড়ল। তালাটা আপনিই খুলে দিলেন।

এবার আমরা কবিতাটির দিকে তাকাই। জিগ্গেস করে জানতে পারি কেশবতী ইরা বেশির ভাগ সময়েই দীর্ঘ বিনুনি দুভাজ করে দুপাশে ঝুলিয়ে রাখতেন। কখনও দীর্ঘ দুটি বিনুনি মাথার পেছনে অথবা সামনের দিকে দুপাশে নেমে থাকতো অনেক, অনেকখানি। কবির চোখে বিনুনি দুটি দুই ঝর্ণা, তবে এরা নিশ্চল, ‘অচল ঝরনা’। কবির দেখা ইরার এই ছবি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের। ইরার বিবরণ ও রবীন্দ্র জীবনীর উপাদান ঘেঁটে কবির এলাহাবাদ সফরের একটি প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এভাবে দিতে পারি ঃ

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ এর ৯ ফেব্রুয়ারি কাশী থেকে এলাহাবাদে পৌঁছোন। শরীর তেমন ভাল ছিল না, তাই সভাসমিতির সংখ্যা ছিল কম। জয়া সেন (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি, কুলদা প্রসাদ সেনের স্ত্রী), রুবি আচার্য (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি?) ইত্যাদি ঘনিষ্ঠজনেরা তখন এলাহাবাদে। এলাহাবাদে আছেন জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার শ্যালিকা কণিকা ও তাঁর স্বামী সুনীত ঠাকুরও। ইরা তখন এলাহাবাদে মাসী কণিকার বাড়িতে। কবি কারও বাড়িতে না থেকে উঠে ছিলেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির কৃষ্ণাশ্রমে। ওখানেই সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতো। কবির সঙ্গে সুনীত ঠাকুর, কণিকা-পুত্র সুজয়, তাঁর বোনঝি ইরা, ইরার ভাই চিত্তভিরামের ছবিটি তোলা হয় তখন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইরার ‘অচল ঝরনা’র ছবিটিও এলাহাবাদের।

প্রয়াগে দেখা ইরার কথা কবির কবিতার প্রথমাংশ জুড়ে। এই সাক্ষাতের বছর পাঁচেক পরের রূপ ধরা দিয়েছে কবিতার দ্বিতীয় অংশে। এখন আর ইরার ‘অচল ঝরনা’ নেই, কেশবতী কন্যার মাথায় খোঁপা। না, শুধু খোঁপা নয়, খোঁপার শরীর থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বেণী বেরিয়ে খোঁপাকে অলংকৃত করে তুলেছে। চাঁদের মতো মুখের ওপর মেঘমালা জমে উঠেছে, তার শোভা অনুপম। এখনকার ইরা আর দ্বিবেণীযুক্ত ইরা নন, শুদ্ধ খোঁপাগরবিনীও নন। কবি এই ইরাকে নাম দিলেন ‘খোবানি’। এই নতুন নামেই এখন থেকে ইরাকে ডাকবেন তিনি।

‘ খোবানি’ মানে কি? ইরা বলেন— কাশ্মীর অঞ্চলের মিষ্টি ফল। বললাম—

—বটেই তো। কাশ্মীরের মিষ্টি ফলের মতোই মিষ্টি আপনার চেহারা, এখনও আপনি কতো সুন্দর। কিন্তু মনে ভাবছি ‘খোবানি" কথাটা খোঁপা আর বেণীর এক ধরনের সন্ধি। খোঁপার মধ্যে অথবা সঙ্গে বেণী, অতএব খোবানি নয়তো?

ইরা বললেন— আপনাকে আর একটি কবিতার সন্ধান দিই, রবিদাদা আমায় লিখে দিয়েছিলেন ১৯৩৩ -এর মার্চ মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। কবি আছেন কলকাতায়, তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর

---

* খোবানী/খুবানী — ফা. খু. বানী (apricot), ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’

নির্দেশনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা লক্ষ্ণৌ গিয়ে 'নবীন' ও 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে ফিরে এসেছে। ওরা ফেরার পর কবি 'শাপমোচন' নৃত্যনাটিকাটিকে নৃত্যগীতে আরও আকর্ষণীয় করে তুললেন, কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে ২৯ ও ৩০ মার্চ এর বিশেষ অভিনয়। ঠিক ওই সময়েই ঠাকুরবাড়িতে রবিদাদার সঙ্গে ইরার দেখা হতো, 'বিচিত্রা' ভবনে জোর কদমে রিহার্সাল চলছে। রবিদাদা বললেন — তুই অভিনয় করিস না কেন, তোকে খুব মানাবে, অভিনয় কর।'

ইরা সেদিন একটি কবিতা চাইলেন, কবি বললেন— 'এখন তো খুব ব্যস্ত আছি রে, পরে দেব, নিশ্চয়ই দেব।' পরের দিন ডাক পড়ল ইরার— ইরা যেতেই কবি তাঁর হাতে তুলে দিলেন নিজের সই করা একটি কবিতা ঃ

শোনা শ্রীমতী ইরা
    কী বিশেষণে মিলে তোমার নাম
সকাল বেলা অনেক ভাবিলাম
    জানি না তুমি অধীরা কি না
        অথবা তুমি ধীরা।
শোনো শ্রীমতী ইরা
    নামের মিল কোন রতন সাথে
ভাবিনু আমি কলম নিয়া হাতে
    নও তো নীলা নও তো চুনী
তুমি কমলহীরা।

ইরা ঠাকুরের বর্ণ অবিশ্বাসনীয়ভাবে সুন্দর, তখন বোধহয় ছিল পদ্মের পাপড়ির রঙ, হীরার মতো দ্যুতিময়। কবির চোখে ইরা কমলহীরা, বস্তুত অতুলনীয়া।

এবং এই ভাবনাস্রোতের মাঝখানেই বাধা পড়ল, মনে এল— 'শেষের কবিতা'য় লিসি অমিত রায়ের প্রবল অনুরাগী বিমি বোস সম্পর্কে সিসিকে বলছিল, — 'অমিত বিমিকে পছন্দ করে না, কিন্তু, ও-তো এম.এ.-তে বটানিতে ফারস্ট। বিদ্যেটাকেই বলে কালচার।' লিসির কথা শুনে অমিত বলেছিল—

'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।' ইরার মধ্যে কবি কি সেই দীপ্তিও দেখেছিলেন?

আলিপুরের নীহারিকা ভবন এখন আমার কাছে সুদূর, তিনবছর আগে ইরা ঠাকুরের দেহান্ত হয়েছে। কিন্তু ওই দিন ওই ভবনের উঁচু থেকে নেমে এসেছিলাম নিচে, তারপর না-ট্যাক্সি, না-ট্রাম, না-বাস—হাঁটতে থাকি, হাঁটতেই থাকি। ঢুকেছিলাম সংশয়াকুল মনে, বেরিয়ে এলাম নিঃসংশয় তৃপ্তি নিয়ে। যে তৃপ্তি আপাদমস্তক জুড়ে — 'বুঝি বা নুপুরে কিছু ছন্দ ছিল।'

বাসায় ফিরে গোপালবাবুকে বার্তা পাঠালাম।

# মরমিয়াবাদে রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজা

**আবুল হোসেন মজুমদার**

**প্রাক্-কথন :**

হাছন রাজার গানের দর্শন ও মরমিয়াবাদ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের শিলচর অধিবেশনের একটি স্মরণিকার জন্য। প্রবন্ধটি পছন্দ করেছিলেন গুণীজন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও অমলেন্দু ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল লেখাটি।

অনুরূপ 'রবীন্দ্রসংগীতে মরমিয়া সুর' শিরোনামেও একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল হাইলাকান্দির রবীন্দ্রমেলার রজতজয়ন্তী বর্ষের স্মরণিকায় তবে খণ্ডিত আকারে। পূর্ণাঙ্গ লেখাটা বের হয়েছিল শিলচরের একটি দৈনিক পত্রিকায় সে বছরের রবীন্দ্রজন্মদিবসে। বোদ্ধা পাঠকরা পড়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অতিন্দ্রীয়বাদী রচনার সঙ্গে ইসলামের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়েও একটি লেখা এই মেলার সপ্তবিংশতিতম বর্ষের স্মরণিকায়ও বেরিয়েছে।

দুজন গীতিকারকে মিলিয়ে কোনও পূর্ণদৈর্ঘ রচনা আমি লিখিনি। আমার চোখেও পড়েনি এরকম কোন লেখা। কিরণশংকর রায় রবীন্দ্রমেলারই উনবিংশতিতম বর্ষের স্মরণিকায় উপহার দিয়েছিলেন একটি নাতিদীর্ঘ রচনা- 'রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রজা চৌধুরী' শিরোনামে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে তিনি সিলেটের এই গীতিকারের নামের দ্বিতীয় অংশে রাজা না লিখে রজা লিখেছেন। এটা একা তাঁর ভুল নয়। অনেক ভাল ভাল গায়কই হাছন রাজার গান গাওয়ার সময় রাজা না বলে রজা বলে থাকেন। এছাড়াও এই নামের বানানে আরও বিভ্রান্তি হয়েছে। অনেকেই সিলেটি উচ্চারণের স্থলে কলকাতার মান্য ভাষার উচ্চারণই ব্যবহার করেন, যা অনুচিত আর শ্রুতিকটুও বটে, কেননা সমস্ত গানের মধ্যে সিলেটি উপ-ভাষারই প্রাধান্য। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন ড০ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী 'হাছন রাজা : তাঁর গানের তরী' বইতে।

প্রাসঙ্গিক এসব কথার পর এখন আসা যাক মূল বক্তব্যে। একটা প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক যে রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজার মধ্যে তুলনা হতে পারে কি আদৌ? রবীন্দ্রনাথ যেমন জমিদার ছিলেন, হাছন রাজাও তাই, কিন্তু দুজনের জমিদারির মধ্যে কত তফাৎ তা ওয়াকিবহাল মহল ভালই জানেন। অনুরূপ সংগীতের জাত ও উৎকর্ষের বিচারে ও অসমতা খুবই প্রকট। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। এটা হাছন রাজাকে ছোট করা নয়। বাস্তবতা। তবে হ্যাঁ, নিজের পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে হাছন রাজা খুবই বড়, তাতে সন্দেহ নেই। এ সঙ্গে আবার এই সত্যটাও অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ যদি এই অখ্যাত পল্লিকবির কথা আনতেন না তাঁর রচনায় ও হিবার্ট লেকচারে, তাহলে হাছন রাজা নিয়ে যেরকম উৎসাহ বাঙালি জাতির (একাংশের মধ্যে), তা হত কিনা সন্দেহ।

### সূচনা :

রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল পল্লি কবির গানের যে কথাটা, তা আশ্চর্যরকমভাবে একাধারে অতি উন্নতস্তরের দর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং মরমিয়াবাদরই তত্ত্বঃ

মম আঁখি হইতে পয়দা হইল আসমান জমীন,
কর্ণ হইতে পায়দা হইল মোহাম্মদী দ্বীন।
শরীর করিল পয়দা ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সভাপতির অভিভাষণে প্রথম রবীন্দ্রনাথ বাউলদের জীবনদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যকবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্বসত্য।' এই 'গ্রাম্য কবির'- 'বিচার করিয়া দেখ সকলেই আমি'- এই গানের আংশিক ইংরেজি অনুবাদ করে তিনি বলেছিলেন, 'এই সাধক কবি দেখেছেন যে শাশ্বত পুরুষ তাঁরই ভিতর থেকে বের হয়ে তাঁরই নয়ন পথে আবির্ভূত হন।' রবীন্দ্রনাথ যে পংক্তিগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি স্তবক উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এর দ্বিতীয় পংক্তি বাদ দিয়ে কবির অনুবাদ এরকম :

The sky and the earth are born of mine own eyes.
The hardness and softness, the cold and heat
are the products of mine own body.
The sweat smell and the bad smell are my own nose.

অন্য অংশটি ছিল এরকম :

হাছনের রূপ দেখিলাম রে রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।
I have seen the vision
The vision of mine own revealing itself
Coming out from within me.

মনে রাখা দরকার যে, এইসব উচ্চারণের মধ্যে যে দর্শনের দেখা পাই তা ফিশ্‌তে নামক দার্শনিকের। যার প্রভাব পাওয়া যায় স্যার মোহাম্মদ ইকবালের কোনও কোনও কবিতায়; রবীন্দ্রনাথে তো বটেই, যেমন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুণী উঠল রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর
সুন্দর হল সে।[২]

### মরমিয়াবাদের পরিচয় :

রবীন্দ্রমেলার রৌপ্যজয়ন্তী স্মরণিকায় প্রকাশিত যে লেখাটির উল্লেখ করেছি এ শুরুতে এভাবেই মরামিয়াবাদের পরিচয় তুলে ধরেছিলাম :

... তবু একথা বলতেই হয় যে, মৌলিকভাবে মরমিয়াবাদের সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে। 'চলন্তিকা'য় পাই, '...সাধারণ বুদ্ধির অতীত গূঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্ববিষয়ক মর্মের বার্তা, মর্মের বাণী'। মরমিয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ mystic সম্পর্কে The Cambridge Paperback Encyclopedia তে লেখা হয়েছে, 'The spiritual quest in any religion for the most direct experience of God. Characteristically, mysticism contain on prayer, meditation, contemplation, and fasting, so as to produce the attitude necessary for what is believed to be a direct encounter with God.'[৩] তবে এই উভয়বিধ বর্ণনায় প্রকৃত মরমিয়াবাদী অভিজ্ঞতা, তার বৈচিত্র্যও বহুমাত্রিক, মিলন-বিরহের আনন্দ-বিষাদ, উচ্ছ্বাস ও তন্ময়তা যা - আনুষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে এক অনির্বচনীয় সংবেদনশীলতাময় জগতের সন্ধান দেয়, যার মধ্যে মিশে আছে বাউল-বৈষ্ণব, লৌকিক-অলৌকিক, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, ঈশ্বর মানুষ-সবকিছুর লীলা, তার কোনও পরিচয় ধরা পড়ে না।'[৪]

এই আলোচনার ইতি টেনেছিলাম আমি এই বলে 'এই পরিচয় আমরা পূর্ণমাত্রায় পেতে পারি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানে, কিছু কবিতায় আর নাটকে।'

উপরের আলোচনায় মরমিয়াবাদের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বাউল, বৈষ্ণববাদের; সুফিবাদ এই প্রবণতার সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথ যে সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রে, একথা সর্বজনবিদিত। তিনি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৬ কার্তিক বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ঠিক প্রাক্কালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে এডওয়ার্ড টমসনের প্রথম গ্রন্থে তাঁকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন :

> আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল — সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ
> দুই বিষয়ের মিলনের প্রয়োজন আছে সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই আছেন
> নাহলে একভাবে সৃষ্টি সম্ভব হইতেই পারেনা।[৫]

বলাবাহুল্য, সুফি কবিদের মধ্যে ফারসি কবি হাফিজের স্থান বলতে গেলে সবার উপরে। হাছন রাজা প্রত্যক্ষভাবে এরকম কারও প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার সুযোগ পাননি, তাঁর শিক্ষাগত অবস্থানও ছিল এ ক্ষেত্রে বাধা। তবে তাঁর গানে সুফিবাদ বিচিত্রভাবেই উপস্থিত থেকে তাঁকে একজন সুফি কবির মর্যাদা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বীকৃতি দান করেছেন, সেও ওই মরমিয়াবাদের সূত্রে, যেখানে মহাকবি আর গ্রাম্যকবি অনায়াসেই হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারেন আমাদের মননে।

## হাছন রাজার সুফিবাদ :

আনুষ্ঠানিক পৈতৃক বা ঐতিহ্যিক ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান তথা সাধনা সাধারণত একঘেয়ে হয়ে ধরা পড়ে কিছু চিন্তাশীল তথা সংবেদনশীল মানুষের কাছে, আর এরকম সময়েই আত্মপরিচয়, পরমের মুখোমুখি দাঁড়ানো, প্রকৃত মিলনের স্তরে পৌঁছবার তাগিদ, বিশ্বচরাচরের মধ্যে তাঁকে এবং নিজেকে একসঙ্গে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে তীব্র হয়ে। এর মধ্যেই আছেন ঈশ্বর। আছে মানব-মানবীর ভালবাসা, বিশ্বচরাচরের জন্য প্রেম। এই তো মরমিয়াবাদের অর্জন, হয়তবা এটা অস্তিত্ববাদের দর্শন। সব মরমিয়া দর্শনই হয়ত বা তাই। এখানেই এসে মিলন ঘটেছে প্রেম, প্রকৃতি আর পুজার মধ্যে। ত্রিবেণী সংগম যেন।[৬] এই ব্যাপারটা সুফিবাদ, বাউল, বৈষ্ণব-সকল মরমী তত্ত্বের মধ্যে সাধারণ। রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজার মধ্যেও মরমী সাধনতত্ত্ব বা মুর্শিদি বিশেষ ভূমিকায় বিদ্যমান। তবে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু প্রচলিত অর্থে কোন মরমী সাধক ছিলেন না, তাই তাঁর কোনও গুরুভজনার প্রয়োজন হয়নি। 'হাছন রাজা যৌবনেই সৈয়দ মাহমুদ আলী বলে পাঞ্জাব থেকে

আগত চিশতিয়া তরিকার (চিশতিয়া সাধন পদ্ধতি) এক দরবেশের মুরিদ হয়েছিলেন। এ দরবেশ সিলেট শহরের অদূরবর্তী রণকেলি নামক গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করার পর সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[৭] হাছন রাজা এই মুর্শিদের উল্লেখ কোথাও করেননি। হয়তবা এই কারণে যে, তাঁর আসল মুর্শিদকে তিনি নিজের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলেন : 'মুর্শিদ আমি খুঁজিব না গো বন জঙ্গলে যাইয়া/আমার মাঝে আমার মুর্শিদ আছে রে পথ চাইয়া।'

আরেকটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজা দুজনই দুটো মননঋদ্ধ প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত মহান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আসলে লোকায়ত ধর্মীয় সংস্কৃতিকে নিয়েছিলেন আপন করে। রবীন্দ্রনাথে যেরকম বাউল-বৈষ্ণব প্রবণতা প্রবল, হাছন রাজাতেও তাই। রবীন্দ্রনাথে উপনিষদ ও ইসলামি দর্শনের রসায়ন হয়েছিল, তেমনি হাছনরাজাতেও ইসলাম এবং বাউল-বৈষ্ণব প্রবণতা দুইই ছিল প্রবল, তাই মাঝে মাঝে দুয়ের মধ্যে সংঘাতের লক্ষণও দেখা যায়। অবশ্য অনেক সুফিই, বিশেষত সুফি কবিরা, মাঝে মাঝে শরিয়তের শুষ্ক দিক নিয়ে তামাশা করেছেন এবং কোন কোন শরিয়তের আইন-কানুনকে অস্বীকারও করেছেন। হাছন রাজা অনেক গানেই নামাজ, রোজা ও শরিয়তি আইনকানুনের উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে, আবার অনেক সময় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাষায়ও। যেমন :

কারে বন্ধে করিবা পার মোল্লার ঝি
কারে বন্ধে করিবা পার।
তোর বাপে করে নামাজরোজা
আমি গোনাগার।
তোমার বাপে দিনে রাইতে নামাজ রোজা করে
লোকসমাজে বসিয়া কেন নিন্দা করে মরে
...    ...    ...
হাছন রাজার আল্লারে মোল্লায় নাহি দেখে
আজলের আন্দি লাগছে কাট মোল্লার আখরে।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন :

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী
আমি সকল দাগে হব দাগী।
...    ...    ...
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে।
যে পঙ্কে এই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।।

হাছন রাজার আল্লা, যাকে কাটমোল্লা দেখতে পায় না, হাছন রাজা দেখেন এবং নানাভাবে পান। সফল সুফি সাধকের একদিকে পরমাত্মাকে পাওয়া আর অন্যদিকে না পাওয়ার একটা টেনশনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এই টেনশনকেলীলা বলি, কিংবা আত্মবিরহ ও আত্মবোধ, কিংবা 'রসের খেলা', এ একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বা ভাবোল্লাস। সফল মরমী সাধকের মধ্যে এ অবস্থা সাধারণ। এই লীলা এই রসের খেলা, এই আস্তত্ব বিরহ নানাভাবে উচ্ছ্বসিত ও বিচ্ছুতি হয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনির্বচনীয় ভাবের জগতে। এর একটু আভাস পরে দেওয়া যাবে। হাছন রাজা এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ কীভাবে করেছেন, তাঁর কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি :

১. হাছন রাজায় কয়, আমি কিছু নয়

অন্তরে বাহিরে দেখি তুমি দয়াময়

এই উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবোন্মত্ততা জন্মে আর

‘উন্মত্ত হইয়া হাছন নাচন করয়’।

২. আল্লারে দেখিয়া হাছন হইয়াছে কানা
নাচিয়া নাচিয়া হাছন গাহিতেছে গানা।

৩. ওগো মওলা, তোমার লাগি হাছন রাজা বাউলা
নাচতে নাচতে হাছন রাজা অইলা এখন আউলা

অথবা

৪. নাচে নাচে হাছন রাজা হইয়া ফানাফিল্লা (আল্লার মধ্যে লীন)

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এভাবে প্রেমাস্পদ, পরমাত্মা, আল্লাহ-র প্রেমে মত্ততা ও তার সঙ্গে পুরোপুরি একাত্মবোধ যাকে অদ্বৈতবাদের পর্যায়ে ফেলা যায়, তা মূল ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাতমূলক। এটা জুড়ে আছে হাছনের বিরাট সংখ্যক গানে। তেমনি নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদের অভিব্যক্তিও তাঁর গানে বড় কম নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ সাধক মাঝে মাঝে সুফিবাদে যাকে ‘হাল’ বা দশাপ্রাপ্তি বলা হয়, সেই অবস্থায় চলে যেতেন, তখন তার বাস্তব অবস্থায় না হলেও অন্তরে একটা খণ্ডতা কাজ করত। তাঁর একেশ্বরবাদী ভাবরাজ্যের পরিচায়ক কিছু গানের অংশবিশেষ তুলে ধরছি :

১. মুমিন আরে ভাই ঈমান রাখিও দড়
ঈমান না থাকিলে মুমিন কিসের নামাজ পড়
ও ঈমান রাখিও দড়।
এক আল্লা বিনে যে শরিক নাহি আর

২. ঠাকুর মোরে পার করবায়নি
পয়সা কড়ি নাই গফুর (পাপ মার্জনাকারী রহিম দয়ালু)
খেওয়ানি।

৩. আল্লা ভব সমদূরে ও আল্লা ভব সমদুরে
তরাইয়া লও মোরে
তরান বরান চাইনা আমি কেবল চাই
তোমারে।
তরাও মারো যাই কর, এর লাগি কে ঝুরে
হাছন রাজার মনের সাধ দেখিতে তোমারে।

এই ৩ নং উদ্ধৃতিতে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসে যেরকম পরকালে নাজাত পাওয়া বা দোজখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়াই ইহকালের সকল সৎকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুফিসাধক তাকে এভাবে দেখেন না। বড়পির আব্দুল কাদির জিলানির একটি শে’র এ আছে (অনুবাদ): ‘আমি’ —পাপীকে তুমি জান্নাতে (স্বর্গে) দাও অথবা দোজখে (নরকে) ফেল। যাই কর আমি খুশি থাকব, কেবল তুমি যদি একবার জিজ্ঞেস কর, হে পাগল তুই কেমন আছিস।’ আরেকজন সুফি কবি বলেছেন: ‘পুনরুত্থানের পর শেষ বিচারের দিন সবাই যার যার আমলনামা (কর্মের হিসেব) নিয়ে ওই ময়দানে যাবে, আমিও যাব (তবে ওই আমলনামা নিয়ে নয়) আমার হাজিরা হবে আমার প্রেমাস্পদের ছবি বগলে নিয়ে।’ ‘অর্থাৎ সাধক প্রেমাস্পদের প্রেমকেই

তার সবকিছুর অভিজ্ঞান হিসেবে নিয়ে যাবেন সেই প্রেমাস্পদের দরবারে। হাছন রাজাও উদ্ধৃত গানের অংশটিতে এই কথাই বলতে চেয়েছেন। সুফিবাদের এ হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়। তিনি আরেকটি গানে বলেছেন :

আল্লা রূপ আল্লা রং, আল্লা রং খুবি
নূরের (আলোর) বাগান আল্লা কি কব তার খুবি।

এই সংগীতকলিগুলো থেকে মনে হয় যেন হাছন রাজা খোদায়ী জগতে, অর্থাৎ আল্লার সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন, যেখানে নূর বা আলো ছাড়া আর কোনও কিছু নেই। কোনও রূপ রং নেই। নূরের বাগান বলে এই ধারণাকে আরও পোক্ত করে দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে কোরআনে নূর বা আলোর উল্লেখ নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। এক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় নানা রূপকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 'আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর বা আলো।[৮] সুফিবাদে ও নূর বা আলোর স্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে যেসব রূপক ব্যবহার করা হয়েছে সেসবের ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে সুফিতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের গানেও আলোর ছড়াছড়ি। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :[৯]

১। আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলাল মিলাল।

২। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলো
সেই ত তোমার আলো।

৩। কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।

৪। ওই আলো যে যায় রে দেখা।

৫। আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।

৬। আলোকের পথে, প্রভু দাও দ্বার খুলে।

৭। আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো
কে এলো মোর অঙ্গনে কে জানে গো।।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজা দুজনেই আলোয় আলোকময়।

## একাত্মতাবোধ

সাধক ও পরমপ্রভু, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, প্রভু ও সেবকের মধ্যে একাত্মবোধ সাধক/ প্রেমিক ও চরাচরের সবকিছুর ঐক্যবোধ মরমিয়া প্রবণতার এক বিশিষ্ট দিক। এদিকেও রবীন্দ্রনাথ ও হাছন একগোত্রীয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেন :

১। সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

২। হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিয়াবে পান
... ... ...
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে

আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
৩। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাই নি
৪। এসো আমার ঘরে এসো.....
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে
৫। মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছে নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।[১০]

হাছন রাজায় এরকম অনুভূতি বা উপলব্ধি বা আকৃতির অভাব নেই একাত্মতাবোধ, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের প্রকাশ ও একাত্মতার জন্য আকুতির ছড়াছড়ি। সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ওপরে। আরও দুতিনটে উদাহরণ দেওয়া যাক :

১। আমি যাইমুরে যাইমুরে
আল্লার সঙ্গে
২। বাঁরে কৈ লুকাইলায় রে - ঘরখানি বানাইয়ারে
বারে কৈ লুকাইলায় রে।
ঘরে বাইরে হাছনরাজায় তুকাইল রে
... ... ...
সকল ঘর বিচারিয়া দেখি টুল্লিতে দুয়ার
সেইখানে বসিয়া আছে বন্ধুয়া আমার।
বন্ধুরে দেখিয়া আমার চিত্ত যে আকুল
হাছন রাজায় গান গায় বাজাইয়া ঢোল।

তুলনীয় : আটকুঠরি নয় দরজা আটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদরকোঠা
আয়নামহল তায়। (লালন)

৩। ও বন্ধু অন্তরিয়া রে
আমি তোরে ডাকি রে
দেখা দিয়া প্রাণ বাচাওরে।
৪। আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে
আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপরে
আর দিনের চক্ষে চাহিয়া দেখ
বন্ধুয়ার স্বরূপরে।

## ক্ষণিকতা পাপবোধ অনুশোচনা

মরমী সাধনায় ক্ষণিকতা, পাপবোধ, অনুশোচনা যে কেবল ভাবোল্লাস, তা নয়, এখানে সাধনা যেমন আছে তেমনি আছে এই জীবনের ক্ষণিকতা বোধ, ইহজাগতিক লোভ লালসা ও পাপকার্যের জন্য

অনুশোচনা - যে পাপ সাধনার ধন, ঈশ্বর, প্রভু, পরমাত্মা থেকে প্রেমিক/সাধককে দূরে সরিয়ে দেয়; দেহ ও আত্মার সম্পর্ক নিয়েও যেমন মরমী সাধকরা উদ্বিগ্ন থাকেন, তেমনি দেহ ছেড়ে আত্মার পলায়ন নিয়ে চিন্তিতও থাকেন, আর প্রায়ই দেখা যায় দেহকে পিঞ্জর আর আত্মাকে পাখি রূপে গ্রহণ করেন মরমী সাধকরা। এই ক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বেশি সরব নন। তার কারণ দুটো, তিনি মরমী প্রবণতাকে ধর্মসাধনা হিসেবে গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যও আছে, এখানে বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে রবীন্দ্রনাথে একেবারেই তা নেই বলা যায় না। আছে, যেমন :

১। ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পাড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরো থরো
কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো...

২। আমি যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধারে মেলে,
মুখ লুকালি মরি আমি
সেই খেদে।।
আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।

৩। সে কোন্ পাগল যায় ...
বাঁধন ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে।

১। বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা কোনে বসে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে'

হাছন রাজায় এ জাতীয় উচ্চারণের ছড়াছড়ি। যেমন :

১। লোকে বলে, ও বলে রে, ঘর বাড়ি ভালা নায় আমার

২। মরণ কালে রে মরণ কালে
কে যাইব তোর সঙ্গে।

৩। আমি না লইলাম আল্লার নাম

৪। আমি বন্দার কি হইব উপায়।

৫। স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ি পুত্র হইল খিল
কেমনে করিবায় হাছন বন্ধের সঙ্গে মিল।

৬। এই তো তোর ধনে জনে সুন্দর সুন্দর স্ত্রী
কেহই না যাইব সঙ্গে যমে নিতে ধরি।

**বৈষ্ণব ও বাউলতত্ত্ব :**

আমি উপরে বলেছি যে, দুটো মহান ধর্মের মননঋদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও রবীন্দ্রনাথ ও হাছন

রাজা দুজনই লোকায়ত বাংলার সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। এই লোকায়ত বাংলার সাধন প্রক্রিয়ার দুটো রূপ বৈষ্ণব ও বাউল সাধনা। বৈষ্ণবতত্ত্ব একটি সমৃদ্ধ দর্শন, তার কয়েকটি ধারা আছে। তবে রাধাকৃষ্ণের লীলা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, তাই রমণ কেবল রাধাকৃষ্ণেতেই হতে পারে, গোপিকাদের সেই অধিকার নেই। বাংলার জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ মুসলমানরা বৈষ্ণববাদে আকৃষ্ট হয়েছেন, তবে তাদের কাছে এর বিস্তার ঘটে ক্রমে একটা সর্বজনীন প্রেমধর্মের রূপ লাভ করেছে। বাংলার মুসলিম বৈষ্ণব সংগীতকার সুফি কবিদের গানে এর প্রমাণ বিদ্যমান। এ সম্পর্কে সবিশেষ ড° শশিভূষণ দাশগুপ্তের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করেছেন ড° নির্মলেন্দু ভৌমিক।[১২]

‘রবীন্দ্রনাথ যে বৈষ্ণব ভাবধারাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে।’[১৩] রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী তো সমগ্রই বৈষ্ণব পদাবলীর সমাহার। এছাড়াও তাঁর অসংখ্য গানে কবিতায় বৈষ্ণববাদ ফুটে উঠেছে। তাঁর তিনটে গীত সংগ্রহের মুখ্য অংশ জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন অভিসারধর্মী গান। তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।

হাছন রাজার বৈষ্ণবধর্মী গান থেকে সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি :

১। কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।
রঙ্গে রঙ্গিলা কানাই’
হাছন রাজা জিজ্ঞাস করে কানাইবা কোন জন,
ভাবনা-চিন্তা কইরা দেখি কানাই যে হাছন।

২। জলে গিয়াছিলাম সই,
কালা কাজলের বাঁশি দেইখা আইলাম সই।

৩। আমার বন্ধু আইনা দে, প্রাণ ললিতে।

৪। মন দিলাম রে বাঁশী, প্রাণ দিলাম

৫। দয়াল কানাই, দয়াল কানাই রে
পার করিয়া দাও কাঙ্গালীরে
ভবসিন্ধু পার হইবার
পয়সা কড়ি নাই
দয়া করিয়া পার করিয়া দাও
বাড়ি চলে যাই।

এই গানের অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাধার খেয়া ঘাটে কড়িহীনভাবে গিয়ে নৌকার মাঝিকে (অবশ্যই কানাই) পার করে দেওয়ার জন্য আকুতি জানানো ও তা নিয়ে মাঝির রসকেলি- নিয়ে অনেক গান বাঁধা হয়েছে। ওই ব্যাপারটাকে এই গানে ভবনদী পার হওয়ার অনুষঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, যা সুফিবাদ বা মরমিয়াবাদের গভীর আকৃতির আভাস দেয়। এখানে কানাই হয়ত গুরু বা মুর্শিদ আর রাধা একজন পুণ্যের সঞ্চয়হীন মানুষ যে তার প্রকৃত বাড়ি পারলৌকিক জগতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরু বা মুর্শিদকে আকুতি জানাচ্ছে। আমার মনে হয় হাছন রাজার এই গান ছাড়া আর কোথাও এই রকম বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গান পাওয়া যাবে না।

বাউলপন্থায় মানুষকেই দেওয়া হয় সর্বোচ্চ স্থান। মানবদেহই বাউলদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রভূমি। এই

দেহের মধ্যেই মনের মানুষ- তিনি ঈশ্বরও হতে পারেন, অন্য কিছুও হতে পারেন। বাউলদের সাধনার শুরুতেই গুরুর কাছে ন্যাড়া বাধতে হয় তারপর শুরু হয় সাধনা।

সে এক বিচিত্র ব্যাপার। তবে অনানুষ্ঠানিক স্বভাববাউল যারা তাদের এতসবের বালাই নেই। রবীন্দ্রনাথ তো স্বীকার করেছেন যে বোলপুরের রাস্তা দিয়ে কে একজনের অনেকদিন আগে গেয়ে যাওয়া বাউলের গান তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই থেকে বাউল ভাবধারা তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছে। কোনও সাধনা, গুরু ধরা ইত্যাদির প্রশ্নই তো ওঠেনি। তাঁর গানে ওই সময় থেকেই বাউলের সুর লাগতে শুরু করে আর তা শতধারায় ঝরে পড়ে তাঁকে বাউলের সমগোত্রীয় করে তোলে।[১৪]

হাছন রাজাও আনুষ্ঠানিক বাউল ছিলেন না, তবে আবুল হাসান চৌধুরী যেমন বলেছেন, 'তাঁর গানে তিনি কখনো 'বাউল', কখনও বা পাগল বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাধন-ভজনের দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক বাউল না হলেও ধ্যানধারণায় বাউলদের সমান ধর্মী ছিলেন। জীবন জগতের মরমী রূপকার হিসাবে তিনি লালন সাঁইয়ের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন'।[১৫] বাউলরা যে সর্বমানবীয় সংবেদনশীলতার পুজারী অসাম্প্রদায়িক মানুষ তা তো সকলেরই জানা। হাছন রাজাও ছিলেন সর্বমানবিক আদর্শের প্রতিপোষক, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর স্থান।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য বাউল গানের মধ্য থেকে মাত্র তিনটি গানের কথাই বলব, যার মধ্যে বাউল ভাবধারা ও সুর চূড়ান্ত স্ফূর্তি লাভ করেছে। যে গানটি সবার জানা :

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায় তাই না হারায় —
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।
... ... ...
কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে।
দেখা মেলে না, মেলে না-
তোরা আয়রে ধেয়ে, দেখরে চেয়ে আমার বুকে
ওরে দেখরে আমার দুই নয়ানে।

দ্বিতীয় গানটি :

সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে
ডাকনা রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়নদ্বারে।

তৃতীয় গান :

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, যে রয় মনে আমার মনে
সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার মনে।

উল্লেখ্য যে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'ও বাউল সুরেরই গান। বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের এর চেয়ে উপযুক্ত সম্ভবত আর কোনও সুরই হতে পারে না।

হাছন রাজার বাউলভাবাপন্ন গানের কিছু পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর তত্ত্ব বহুমাত্রিক,

আবার বাউলদের চেয়ে কিছু ভিন্ন রকম। যেমন তিনি এক আল্লাহে বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেন এভাবে :

হাছন রাজা কয়
এক বিনে দুই নাই আল্লাহ জগৎময়।
কোনো জায়গা ছাড়া নাই
মাবুদ আল্লাহ কয়
আল্লাহ বিনে কিচ্ছু নয়
সবই আল্লাহ হয়।
ত্রিজগৎ জুড়িয়া দেখি
ঠাকুর আল্লাহময়।

এই উচ্চারণে সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে কোরআন কথিত আল্লাহর সর্বত্র অবস্থান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/তাই হেরি তায় সকলখানে' গানটিরও রেশ।

বাউল সত্তার পরিচায়ক তাঁর অন্য একটি গানের এই অংশটিতেও :

ও যৌবন যমেরই স্বপন
সাধন বিনে নারীর মনে হারাইলাম মূলধন।

বাউল হওয়ার রহস্য ভেদ করে বলেছেন হাছন রাজা—

বাউল বানাইল রে
হাছন রাজারে বাউল কে বানাইলবে
বানাইল বানাইল বাউল তার নামটি মৌলা
দেখিয়া রূপের চটক হাছন রাজা আউলা

... ... ...

হাছন রাজায় গাইছে গান হাতে তালি দিয়া
সাইক্ষাতে দাঁড়াইয়া শোনে হাছন রাজার প্রিয়া।

মরমী সাধক কবিদের, বিশেষত বাউলদের গানে পাখির অনুষঙ্গের ছড়াছড়ি। পাখি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়; কখনো আত্মা অর্থে, আর এ অর্থে ব্যবহারই ব্যাপক। বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনাও তার একটি বিখ্যাত কবিতায় (আত্মা বিষয়ক, আত্মাকে স্বর্গীয়পাখি রূপে দেখিয়ে বলেছেন 'ছাড়ি' তার উচ্চনীড় এসেছে সে নামি আজুল মওদুদ-এর অনুবাদ। লালন ফকিরের যে গানের অংশবিশেষ উপরে) এ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে কবিগুরু এর যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, এরা বাইরে আমি আর অন্য কিছু বলতে চাই না। আরেকটি গানে আছে: 'একটা বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়/পাখি কখন জানি উড়ে যায়।' এখানে আমার মনে হয় আত্মারই রূপক হিসেবে পাখির ব্যবহার। শিতালাংশাহ এর গানে 'শুয়া পাখি' ব্যবহৃত হয়েছে আত্মা অর্থে। হাছন রাজার গানে আত্মা অর্থেই পাখির ব্যবহার নানান স্থানে। যেমন, 'মাটির পিঞ্জিরার মাঝে শুয়াবন্দী হইয়ারে/কান্দে হাছন রাজার মন মনিয়ায় রে'।/ মন মনিয়া রে, ও মোর মন মনিয়ারে/কুনদিন যাইবায় মনিয়া/তুমি উড়িয়া রে, তুমি তো হাওই মনিয়া শূন্যে যাইবায় উড়িয়া।/আমি তো মাটির মনিয়া/মাটিত রইমু পড়িয়া।'

এছাড়াও পাখি দেহরূপ 'পিঞ্জিরায়' বন্দী জীবাত্মার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, যে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার কাছে যাওয়ার/সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য আকুল— সেই স্বর্গীয় জগতে যেতে, যেখান থেকে তার আগমন।

এই অর্থে সুবিখ্যাত সুফি কবি জালালুদ্দিন রুমি বাঁশিকে ব্যবহার করছেন তাঁর ফার্সি ভাষায় কোরআন আখ্যাপ্রাপ্ত 'মসনবি শরিফ'-এ। উল্লেখ থাকে যে এই কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন গীতাঞ্জলির অন্যতম ফার্সি অনুবাদক রাওয়ান ফরহদি।

## উপসংহার :

আমার এ রচনা রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজার মধ্যেকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের একটি প্রাথমিক প্রয়াস, যার জন্য পরিসরও সীমাবদ্ধ, তাই আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দিতে হয়েছে। এবিষয় নিয়ে একটি বড় কাজ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের দেশের শিক্ষিতজনেরা আমাদের দেশের ইতিহাস ভাল করে আত্মস্থ করেন নি, তাই হিন্দু মুসলমান মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পড়ন্ত মানুষের অন্তরের গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনকে তারা বহন করে এনেছে। 'বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই শিক্ষা দেখি, এই জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। একত্র হয়েছে অথচ কেউ আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরানে পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।'[১৬]

এই সূত্রেই হাছন রাজা সম্বন্ধে শামসুজ্জামান খান যা লিখেছেন, তা উদ্ধার করে এই নিবন্ধের ইতি টানতে চাই।

> হাছন রাজাকে হিন্দুত্ব মুসলমানিত্বের শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে ফেলে বিচার করা হবে একেবারেই অসমীচীন। তিনি ছিলেন একজন সষ্টিশীল কবি ও মরমিয়া সাধক। তাঁর বিস্তার মৌলিকতা ও ভাবগভীরতার জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। বাংলার ভাব সাধনায়,... বহু মত পথ ও পন্থার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটেছে। সামাজিক শক্তির বিন্যাস গণমানুষের আত্মিক ও আদর্শিক ঝোঁক ও প্রবণতা দ্বারাই এর দ্বন্দ্বায়ক (Dialectics of evolution) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এতে হিন্দুত্ব মুসলমানিত্ব বা শাস্ত্রীয় ধর্মের হুবহু অনুসরণ ধারা খুঁজে লাভ নেই।[১৭]

অর্থাৎ সংকর জাতি বাঙালির মিশ্র সংস্কৃতিরই স্মরণ এই কবি-সাধকের রচনাও যার সঙ্গে মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরও রয়েছে আশ্চর্যরকম মিল।

## তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটি বিশ্বভারতী (ত্রৈমাসিক) এবং মডার্ন রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও মাঘ ১৩৩২ সংখ্যার প্রবাসী এবং বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। মূল ইংরেজি অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তরই আমরা পেয়েছি। —হাছনরাজা সমগ্র: সংগ্রহ-গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : দেওয়ান মোহম্মদ তাছাওয়ার রাজা : পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ২০০০, পৃ: ৭১

২. শ্যামলী, আমি, সঞ্চয়িতা, পৃ। ৭১১

৩. The Cambridge Paperback Enclyclopedia

৪. রবীন্দ্রসঙ্গীতে মরমিয়া সুর, রবীন্দ্রমেলা স্মরণিকা ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, হাইলাকান্দি

৫. রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, সজনীকান্ত দাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ: ১০৭

৬. আবুল হোসেন মজুমদার, প্রাগুক্ত

৩. The Cambridge Paperback Enclyclopedia
৪. রবীন্দ্রসঙ্গীতে মরমিয়া সুর, রবীন্দ্রমেলা স্মরণিকা ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, হাইলাকান্দি
৫. রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, সজনীকান্ত দাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ: ১০৭
৬. আবুল হোসেন মজুমদার, প্রাগুক্ত
৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, হাছন মানসের ধারা ও তাঁর সাহিত্য, হাছন রাজা সমগ্র ৩য় পর্ব, পৃ: ৫৬৪
৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬৪; আল কুরআন, সুরা নুর আয়াত ৩৫
৯. গীতবিতান
১০. গীতবিতান
১১. গীতবিতান
১২. শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত : প্রথম অধ্যায়, পৃ: ২৬
১৩. সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য, পৃ: ১০৬; কল: ১৪০৮ বাংলা
১৪. জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন 'ইহার (আমি চিনি গো চিনি .... রচনায়) অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়ে কে গাহিয়া যাইতেছিল —

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।' জীবনস্মৃতি, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৪১০, পৃ: ১১৬

১৫. আবুল আহসান চৌধুরী, হাছন রাজার মরমী সঙ্গীতভুবন, হাছন রাজা সমগ্র, পৃ: ৭১৯
১৬. আশীর্বাদ, হারামনি, মনসুর উদ্দিন
১৭. শামসুজ্জামান খান, ভূমিকা: হাছন রাজা সমগ্র, ঢাকা, পৃ: ২৯-৩০

# চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ

**জন্মজিৎ রায়**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী (১৪৮৬-১৫৩৩) আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সারস্বত উজ্জীবনের দুই অমিতপ্রতিভ মন্ত্রদাতা যুগপুরুষ। বাঙালির সংস্কৃতিক ভূমণ্ডলের পূর্বার্ধ ও পরার্ধ দ্বিধাচিহ্নিত হতে পারে যথাক্রমে চৈতন্যায়ন ও রবীন্দ্রায়ণ অভিধায়। চৈতন্যদেব বাঙালির জাতিসত্তার প্রথম সমৃদ্ধর্তা, ষোড়শ শতকের চৈতন্য-রেনেসাঁসের অদ্বিতীয় স্থপতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের পথিকৃৎ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিধর্ম, বৈষ্ণব দর্শন ও কাব্যসাহিত্যের প্রেরণার উৎস, মস্তা ও নিয়ন্তা। আর রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের মধ্যমণি, যাঁর হাতে রয়েছে আধুনিক বাঙালির চিন্তাভাবনার সর্বদিত্তমুখী গতাগতির রথাশ্বরজ্জু, বাঙালির মনোজগতের এই দুই মনস্পতির মধ্যবর্তী চতুঃশতকের ব্যবধান আসলে অলীক এবং স্বতঃসেতুবন্ধা।

চৈতন্যদেব একাধারে যুগকারক ও যুগতারক; দীনার্তশরণ ও পতিত পাবন; স্বীয় জীবদ্দশায় অবতারপুরুষ রূপে শ্রীবাস-অঙ্গনের মহাভিষেক-উৎসবে বন্দিত। চৈতন্যদেব রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ, যাঁর নর্তনে-কীর্তনে প্রকট হয় স্বেদাশ্রুকম্পমূর্ছার অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার, আর রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের বেদান্ত-দীপিত ব্রাহ্মধর্মের এক পুরোধা, যাঁর 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' এবং যাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষে মহা ওঙ্কারধ্বনি 'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।' তবু একথা অনস্বীকার্য যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিমার্গ আর বেদান্ত-প্রাণিত একেশ্বরবাদের আপাত-বৈপরীত্য অলীক ও ক্ষণভঙ্গুর। তাই রবীন্দ্র-জীবনে এই সত্যের সাক্ষ্য অকাট্য ও নিত্যনয়নগোচর।

চৈতন্যদেব সংসারত্যাগী, বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসী পুরুষ, যাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মানব-সংসারে প্রেমভক্তি আর নাম সংকীর্তন প্রচার করা। কেননা, কলিযুগে জীবের উদ্ধারের 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' :

কলিযুগে ধর্ম হয় নামসংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।[১]

. . .

সংকীর্তন পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেমভক্তির প্রচার।।[২]

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবশিষ্য ও সংসারী মানুষ। তিনি ভক্তিমান হলেও তাঁর ভক্তি ভিন্নধর্মী। চৈতন্যদেবের ভক্তির প্রকাশ উদ্বায় নর্তনে-কীর্তনে আর সর্বাঙ্গ-দৃশ্য স্বেদ-পুলক-অশ্রু-কম্পের মধ্যে :

প্রভু বোলে কোনরূপ দেখহ আমার।

পড়ুয়া সকলে বলে যত চমৎকার।।
যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত কভু কোথা নাহি দেখি আর।।[৩]

… … …

তাহার কেমন রীত বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্ছা যায়।।[৪]

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি অলৌকিক, তার বহিঃপ্রকাশও অলৌকিক। এটা মানব-সংসারের অভিজ্ঞতা ও আলোচনার বহির্গত বিষয়। এটা সাধারণ মানুষের সাধ্যবস্তু হতে পারে না। উনিশ শতকের যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই অলৌকিক ভক্তি অন্বিষ্ট নয়। আর গৈরিক বসনধারী কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্নপদ দীর্ঘকায় মুন্ডিতশিরস্ক চৈতন্যদেবর ভোগবাসনাহীন, কঠিন ও কৃষ্ণতাশুষ্ক বৈরাগ্যও গৃহস্থ কবির কাছে কাম্য হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই তাঁর দ্ব্যর্থকতাহীন স্পষ্ট ভাষণ:

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।[৫]

বিশ্বের রূপ-রস-মাধুর্যের প্রতি নান্দনিক মুগ্ধতার মধ্যেই কবির মনের মুক্তি। আর সৃষ্টিলোকের প্রতি প্রীতি-অনুরাগের মধ্যেই তাঁর ভক্তি :

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।[৬]

রবীন্দ্রনাথের কাছে কাম্য যে ভক্তি, সে ভক্তি ভাবোন্মাদনাহীন, অপ্রমত্ত, শান্তরসাস্পদ ও সুস্থির :

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোম্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।
                    দাও ভক্তি, শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসার ভবনদ্বারে।[৭]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কীর্তনমুখর, নৃত্যগীতোচ্ছাসময় ভক্তি আর রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট আর্যপ্রজ্ঞাদীপ্ত, শান্তস্নিগ্ধ ভক্তি অবশ্যই পৃথক। চৈতন্যদেবের জীবনে প্রকট হয় যে মহাভাব বা হ্লাদিনীশক্তি - স্বরূপিনী রাধিকার প্রণয়-মহিমা, তা তাঁর জীবনকে করে তোলে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অমর মহাকাব্য। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৩) যখন গঠন করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, তখন সেখানে প্রবেশ করে ভক্তির আবেগ আশ্রয় করে বৈষ্ণবীয় প্রভাব। আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাই চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তির আবেগ ও ভাবোচ্ছাস সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্ক ও সংযত। রবীন্দ্রনাথ যখন চৈতন্যদেব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ততম মন্তব্যও করেন, তখনও তাঁর ব্রাহ্মধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও ভক্তি-ভাবাতিশয্য সম্পর্কে দীর্ঘলালিত ধারণা প্রকাশিত হয় :

> পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খেপা দেবতা মহেশ্বর।[৮]

রবীন্দ্রনাথ সংসারের সকল মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই অরূপরতন খুঁজে ফিরেছেন, সীমার বন্ধনের মধ্যে খুঁজেছেন নিত্যমুক্ত অসীমকে। তাঁর সাধনা গৃহীর সাধনা। তিনি চিরকালই সন্ন্যাস-বিরোধী, সংসার -জীবনকে অস্বীকার করাটা যে ভুল, এটা তিনি একাধিক রচনায় বলেছেন। যেমন :

> কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
> ‘গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
> কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?’
> দেবতা কহিলা, ‘আমি’। শুনিল না কানে। [৯]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সংসার-বৈরাগ্য ও ভক্তি-ভাবোন্মাদনা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি।

## । ২ ।

চৈতন্যদবের কৃষ্ণতাপ্ত উৎকট বৈরাগ্য আর দিব্যোম্মাদনা (divine ecstasy) তাঁর জীবনের অধ্যাত্মবাণীকে সোচ্চার করে তুলেছে। অধ্যাত্মবাণীর ভাষ্যকার বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পদকর্তা বাসু ঘোষের পর্যবেক্ষণ যথার্থ ও সত্যমূলক যে, চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হলে ‘রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে।’ কিন্তু চৈতন্য-জীবনলীলার একটা সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি ব্রাহ্মাণ-চন্ডালের কোলাকুলি করিয়ে বলেছেন, ‘চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।’ সমাজের মানহীন মানুষকে মান দান করে হরিনাম-কীর্তনের বিধান দিয়েছেন তিনি। ‘অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ।’ বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বাণী মধ্যযুগীয় বর্ণান্ধতার অন্ধকারে নিয়ে এসেছিল প্রগতিশীলতা আর মানবিকতার সৌরালোক। তাঁর ধর্মান্দোলনের দুই সহচরের মধ্যে নিত্যানন্দ ছিলেন বেদবাহ্য ‘অবধূত’ ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং অপরজন, যবন হরিদাস, বর্ণহিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য। সুতরাং চৈতন্যদেব ষোড়শ শতকের কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা এক সন্ন্যাসী মাত্র নন। তাঁর দিব্য জীবন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক, এই দ্বিমুখী তাৎপর্যের আলোকেই ‘মহতোমহীয়ান’। অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবের কাছে একদা এই প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভক্তি বিতরণ করতে হলে চৈতন্যদেব যেন স্ত্রী, শুদ্র ও মূর্খ মানুষকে ভক্তিদান করেন: ‘স্ত্রীশূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা’।[১০] ষোড়শ শতকে উৎকট সামাজিক বৈষম্যের যুগে স্ত্রী, শূদ্র ও তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষ সংঘবদ্ধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রতলে।

চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনের এই সামাজিক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর মন ও মননকে কতটা আভিমুখ্য দান করেছিল, তার পরিচয় আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। প্রসঙ্গত ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতার অংশবিশেষ এখানে স্মর্তব্য :

> যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
> সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে —

সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।[১১]

দীন-হীন মানুষকে মানদান করেই কেবল হরিনাম-সংকীর্তন বিধেয় বলে ঘোষণা করেন চৈতন্যদেব। কিন্তু বর্ণকৌলীন্য, জাত্যহংকার, শিক্ষাকৌলীন্য কিংবা ধনগরিমা দীন-হীন, রিক্তভূষণ মানুষের চরণে প্রণাম নিবেদন করতে বাধা দেয় :

যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের ঢলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।[১২]

বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ আন্দোলনের অগ্রপথিক চৈতন্যদেবের আরদ্ধ কর্মযজ্ঞে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয় আধুনিক কালে। রবীন্দ্রনাথকে তখন খেদোক্তি করে বলতে হয় :

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের অধ্যাত্ম-সামাজিক প্রভাব ও তাৎপর্যের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

> বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি; সে শক্তি বলরূপিনী নহে, প্রেমরূপিনী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে, এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে; বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকেই নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।
>
> বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্যস্থাপন করিয়া প্রেম প্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা ছন্দ ভাব তুলনা উপমা ও আবেগের প্রবলতা-সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। . . .
>
> . . . বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য; যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এদেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্ত যুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল, বৈষ্ণবযুগে অযাচিত-ঐশ্বর্য-লাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে প্রেমের শক্তিতে বলবান বৈষ্ণবধর্ম মধ্যযুগে সামাজিক সাম্য-সৃষ্টিতে এবং নূতন ভাব, ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের মানোন্নয়ন ও অভিনব পরিবর্তন-সাধনে যে অসাধারণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলার সমাজ-জীবনে ও সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ও যুগান্তকারী ভূমিকার মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ যে এখানে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, সে সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ নেই।

### । ৩ ।

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা রোমান্টিক-মিস্টিক, ধ্রুপদী-লোকায়ত প্রণয়কথা আর প্রেমগীতিকার অবারিত, অনি :শেষ উৎস। সাতবাহন হালের 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) থেকে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার কবি-ভগীরথ মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পর্যন্ত তার রূপে রূপান্তরে বিচিত্র অন্তপ্রকাশ। রবীন্দ্র-কাব্যেও তার প্রচ্ছন্ন-প্রকট সঞ্চরণ কখনো শব্দৈকনির্ভর, কখনো রূপকাশ্রিত, কখনো বা একান্ত সাঙ্কেতিক। রবীন্দ্রনাথ কখনো বৌদ্ধ, কখনো শৈব, আবার কখনো বা ভক্তবৈষ্ণব। কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিই আবার বলেন :

> যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল-বালক
> তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।।
> যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে,
> যারা গুঞ্জাফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে,
> যারা বৃন্দাবনের বনে
> সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
> যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল কালো জলে।
> যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে।।[১৫]

বংশীবাদক কৃষ্ণের বাঁশি যাঁকে বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে বংশীবটের তলে ডেকে নিয়ে যায়, সেই রবীন্দ্রনাথ সখ্য, দাস্য আর শান্ত রসেই স্বস্তি, শান্তি আর তৃপ্তি খুঁজে পান। রবীন্দ্রনাথের 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' কিংবা 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি' প্রভৃতি আত্মমগ্ন উচ্চারণ কতটা 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব' শ্লোকের প্রতিফলন, সে সম্পর্কে সংশয় থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।[১৬] কেননা, রবীন্দ্রনাথ আসলে বৈষ্ণবীয় মধুর রসের উপাসক নন এবং বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রসও নয় তাঁর অন্বিষ্ট।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব প্রকৃতপক্ষে দ্বিবিধ (এক) প্রত্যক্ষ বা বহিরঙ্গ এবং (দুই) পরোক্ষ বা অন্তরঙ্গ। প্রথমোক্ত প্রভাব বিষয়ে বলা যায়, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা মহাত্মা গান্ধী নিয়ে যিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, তিনি চৈতন্যদেব সম্পর্কে সে রকম কিছু রচনা করেননি। বুদ্ধদেব, রামদাস, শুরু গোবিন্দ সিং, শিবাজিকে নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বারা প্রাণিত হয়েও তিনি 'অভিসার','পূজারিণী','শ্রেষ্ঠভিক্ষা', 'পরিশোধ' প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব বা চৈতন্য পার্ষদ নিয়ে তিনি লেখনী-কার্পণ্যের পরিচয় দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে সনাতন গোস্বামীকে নিয়ে রচিত 'স্পর্শমণি' কবিতাটি অবশ্যই বিরল ব্যতিক্রম। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্ম নয়, বৈষ্ণবসাহিত্য, বিশেষ করে পদাবলী সাহিত্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে অমোঘ আকর্ষণ। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আর অন্যান্য বৈষ্ণব কবি-প্রসঙ্গ তাই তাঁর প্রবন্ধে বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জাতীয় কয়েকটি

প্রবন্ধ হচ্ছে 'কেকাধ্বনি' (বিচিত্র প্রবন্ধ), 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' (সাহিত্য), 'সাহিত্য সম্মিলন' (সাহিত্য, 'সাহিত্য সৃষ্টি' (সাহিত্য)। বৈষ্ণব কাব্যের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> বৈষ্ণব কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝর্ণা বাহির হইল।[১৭]

বৈষ্ণব কাব্য যে বিশ্বসাহিত্যের স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে বৈষ্ণবধর্মেরই প্রভাবে, এই সত্যও স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

> বৈষ্ণবধর্ম প্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চ-নীচ শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল সেইদিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।[১৮]

বৈষ্ণব পদাবলী তো পাঠ্য কবিতা মাত্র নয়, গেয় গান। তাই সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাছে এর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। আর পদাবলীর বিষয় কেবল সংসার-নিরপেক্ষ তুরীয় ভগবৎ-প্রেমই নয়, বরং মানব-সংসারের অন্তহীন হৃদয়-লীলার মধুস্যন্দী সুরলহরী। রবীন্দ্রনাথও এই প্রতীতি ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায় :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে, বৈষ্ণবের গান!
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
বৃন্দাবনগাথা- এই প্রণয়াস্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
শরমে সম্ভ্রমে, একি শুধু দেবতার!

. . .

এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।[১৯]

উক্ত কবিতা রচনার অল্পাধিক এক দশক আগে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়েরও সন্ধান পেতে পারি আমরা যে, রাধা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই হৃদয়-কুটিরবাসী অন্তরাত্মা :

এখনও সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে—
এখনও প্রেমের খেলা।
সারা নিশি সারা বেলা,
এখনও কাঁদিছে রাধা হহৃদয়-কুটীরে।[২০]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনা অথবা রাধার নামোল্লেখ আর ততটা দেখতে পাওয়া যায় না। পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব্যঞ্জনাগর্ভ

কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখি আমরা, যেমন, বাঁশি, বঁধু, অভিসার, অভিসারিকা, কুঞ্জ, কুম্ভ, যমুনা, তরী, বিচ্ছেদ, বিরহ, মিলন, সখী, সখা ইত্যাদি। বৈষ্ণবীয় প্রভাব ততদিনে হয়েছে অন্তস্তলশায়ী ও অন্তঃসলিল। এটাই প্রকৃতপক্ষে অন্তরঙ্গ প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ 'সোনার তরী' কাব্যের 'হৃদয় যমুনা' কবিতাটির কথা বলা যেতে পারে। কবিতাটিতে কেবল রাধাকৃষ্ণ অনুপস্থিত। এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর 'আলম্বন-বিভাব' না থাকলেও 'উদ্দীপন-বিভাব' আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত। যেমন, 'বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তলসম', 'নুপুর-রিনিকি-ঝিনি', 'কুম্ভ', 'শ্যাম দূর্বাদল', 'নবনীল নভস্থল', 'বিকশিত বনস্থল', 'কুঞ্জে তৃণাসনে', 'কলস ভাসায়ে জলে', 'নীলাম্বর', 'নীলনীর', ইত্যাদি শব্দ সম্ভারে যমুনাতটের বর্ষাকালীন পরিবেশ চিত্রিত এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা আভাসিত।

অদ্বৈতবাদে লীলার প্রসঙ্গ অবান্তর। লীলার স্থান দ্বৈতবাদে, যেখানে ভক্ত-ভগবান বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন-বিরহের লীলাবিলাস অনন্ত মাধুর্যময় ও রহস্যঘন। ব্রাহ্মধর্মে আশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদী ও লীলাবাদী। কবি কৃষ্ণের লীলা-সহচর রাখাল বালকদের মতো বংশীবাদক। কাব্যসৃষ্টি আর বাঁশি বাজানো সমার্থক। 'বাঁশি' কবির কাছে সৌন্দর্য-মাধুর্য সৃষ্টির প্রতীক। কাব্যসৃষ্টি যেন এক লীলা। বৈষ্ণব পদাবলীর যেমন হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিণী রাধা, রবীন্দ্রকাব্যে তেমনি কাব্যের সৃষ্টিশক্তি-স্বরূপিণী 'লীলাসঙ্গিণী'। এই লীলাসঙ্গিণীর গুণ্ঠনবতী রূপ আছে 'পূরবী' কাব্যে। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে 'বাঁশি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১২টি কবিতায়, আর 'লীলা' শব্দ ৪টি কবিতায়। 'ভানুসিংহের পদাবলী' কাব্যে যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ছিল ব্রজবুলি ভাষার পদলালিত্য আর সাংগীতিকতা-নির্ভর, সে প্রভাব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে অন্তর্দেশশায়ী গূঢ়সঞ্চারী। বাঁশি হয়েছে সানাই। রসসৃষ্টির বৈকুণ্ঠলোকে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির পার্থক্য থাকে না, ছেঁড়া ছাতা আর রাজছত্র এক হয়ে যায়, ব্রজবুলির শব্দমাধুর্য আর গদ্য কবিতার আটপৌরে ভাষা বসতে পারে একাসনে।

## । ৪ ।

রবীন্দ্র চেতনার অন্তঃসংজ্ঞ স্তরে চৈতন্যদেবের উপস্থিতি নিঃশব্দ ও নীরব। রবীন্দ্র-মানসে বৈষ্ণবীয় প্রভাব অন্বেষায় দেখা যায়, তাঁর মন স্বীকরণ-অস্বীকরণ ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিসর্পিত। ব্রাহ্মধর্মের দ্বৈতবাদে অবতারবাদ অস্বীকৃত। অবতারবাদের ভিত্তি দ্বৈতবাদী ভক্তের আবহমান বিশ্বাস আর সংস্কারে। তাই ঐতিহ্য আর সংস্কার বর্জন না করে বিশ্বযুদ্ধের আগ্রাসী বিভীষিকায় সংশয়াপন্ন কবি অবতারকে ভগবানের দূতরূপে মেনে নিয়েও আশাভঙ্গের বেদনা ব্যক্ত করে ব্যর্থ নমস্কারে জানিয়েছেন প্রত্যাখ্যান :

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে —
. . .
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।।[21]

কেবলমাত্র চৈতন্যদেব নন, যুগে যুগে আবির্ভূত সকল অবতারের বাণীর প্রাসঙ্গিকতাতেই রবীন্দ্রনাথের অনম্য সংশয়। 'প্রশ্ন' কবিতায় কবিকণ্ঠে উচ্চারিত অবতারদের বিরোধিতা যুক্তিবাদীর দার্শনিকতা থেকে নয়, মানবতাবাদীর অসহায় অভিমান থেকে উঠে এসেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস আর ঐতিহ্য থেকে যে আধুনিকতার আলোকতীর্থে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করেছেন, সেখানে তাঁর পাথেয় মানবতাবাদ, মৈত্রী, অহিংসা আর প্রেম।

'রাজর্ষি' উপন্যাস বা 'বিসর্জন' নাটকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের জীবহত্যা বা বলি-প্রথার বিরোধিতা এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমিষ আহার-বর্জন কতটা বৌদ্ধ প্রভাব-জাত আর কতটা বৈষ্ণবীয়, তার মীমাংসা

এখানে জরুরি নয়। বরং এই জানার আনন্দটাই বেশি জরুরি যে, কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা প্রবন্ধ সাহিত্যেই নয়, তাঁর কথা সাহিত্যেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। এখানে তাঁর কয়েকটি মাত্র ছোটগল্প থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব, চরিত্র ও পরিবেশ চিত্রণে তাঁর উৎসাহ, প্রেরণা ও প্রবণতার ওপর আলোকপাত করতে পারে—

১. ছোটো ছোটো কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন-

   যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা।
   তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝুগাতা।।[২২]

২. (পুণ্ডরীক) বলিলেন, ‘রাধা প্রণব ওঙ্কার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। ‘রা’ অর্থেই বা কী, ‘ধা’ অর্থেই বা কী, কৃষ্ণ শব্দের ‘ক’ হইতে মূর্ধণ্য ‘ণ’ পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্নভিন্ন অর্থ হইতে পারে, তাহা একে একে মীমাংসা করিলেন।[২৩]

৩. (বিপিনবাবু) বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্তকরুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।[২৪]

৪. হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়াছিল এবং তাহার অদূরবর্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল-

   এসো এসো ফিরে এসো- নাথ হে, ফিরে এসো।
   আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
   বঁধু হে, ফিরে এসো।[২৫]

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের বিষয়টিও একান্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। বৈষ্ণবীয় ধর্মাদর্শ ও নীতিবোধ একজন অতি সামান্য গ্রাম্য বিধবা রমণীকে হঠাৎ কীভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন আপাত-কঠোরতার মধ্যে মানবতা ও জীবে দয়ার চিরন্তন মহত্ত্বের আলোকে খাপছাড়া রকম মহীয়সী করে তুলতে পারে, তারই উদাহরণ ‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পের জয়কালী দেবীর চরিত্রটি। প্রয়াত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা পত্নী জয়কালী দেবী রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। নিঃসন্তান জয়কালী দেবী তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি পৌরুষভাবাপন্ন এমন একজন স্ত্রীলোক, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর নষ্টপ্রায় দেবোত্তর সম্পত্তির বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির ও বহুকালের দখল উদ্ধার করেন। ঠাকুরবাড়িটিই জয়কালী দেবীর কাছে স্বামী, পুত্র ও সংসারের মতো সবচেয়ে প্রিয়। অন্যত্র কঠোর ও উদ্ধত হলেও দেবালয়ের বিগ্রহের কাছে তিনি সম্পূর্ণ অবনম্র ও সমর্পিত। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষায় তিনি সর্বদা সতর্ক ও সচেষ্ট। একদিন ডোমের দলের তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে ভীত বলির পশু একটা শূকর যখন তার দেবালয়ের প্রাঙ্গণে লতাবিতানের মধ্যে আশ্রয় নেয়, তখন শুচি-অশুচির চিন্তা না করে এই অপবিত্র বধ্য পশুটিকে জননী-হৃদয়ের পরম স্নেহে জয়কালী দেবী সুরাপানোন্মত্ত ডোমের দলের হাত থেকে রক্ষা করেন। মন্দিরের শুচিতা রক্ষার চেয়ে জীবের প্রাণ রক্ষাই তাঁর কাছে শ্রেয় বলে

মনে হয়। আচার-প্রথার চাইতে হৃদয়-ধর্মই যে বড়, আপাত-কঠোর ও রক্ষণশীল জয়কালী দেবীর চরিত্রে এই সত্যের আকস্মিক বিদ্যুৎদীপ্তি তাঁর চরিত্রের নিহিত মানবতা ও বৈষ্ণবীয়তাকে আলোকিত করে তোলে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ভিন্ন প্রকৃতির। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে হিতবাদী ও মানবতাবাদী নাস্তিক জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসের চরিত্রে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এবং বৈষ্ণবীয় জীবনচর্যার রসাস্বাদনের নারী-বর্জিত সমুদ্রতীরে সাধারণ সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার জয় ঘোষণা হচ্ছে উপন্যাসের মূল সুর। বৈষ্ণবীয় ধর্মচর্যায় নির্জিতেন্দ্রিয় বিধবা যুবতী দামিনীর রক্তমাংসল বাস্তব জীবনসত্তার সার্থকতা কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু সুখী সংসার-জীবনের মাঝখানে দামিনীর আকস্মিক মৃত্যু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উপজীব্য জীবন-সমস্যাকে অমীমাংসিত ও সকল প্রশ্নের উত্তরকে অসমাপ্ত করে রেখে দেয়। পাটের ব্যবসায়ী অন্নদাপ্রসাদ দামিনীর বিবাহে জামাতা শিবতোষকে কলকাতায় একটা বাড়ি ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। শিবতোষ সংসার-বিরাগী এবং বিবাহের পর লীলানন্দ স্বামীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে। দামিনীকে ভক্তিমতী করে তোলার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর শিবতোষের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার দণ্ড দান করে যায় শিবতোষ। সকল সম্পত্তি সমেত দামনীকে সে লীলাবন্দ স্বামীর হাতে সমর্পণ করে যায়। এদিকে দামিনীর নজর শচীশের দিকে। কিন্তু শচীশ বাস করে ভাব আর রসের জগতে। সেখানে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও যোগমায়ার নিত্যলীলা। করতাল বাজিয়ে নেচে নেচে কীর্তন করে শচীশ একদিন বলে যে, দামিনীকে তাদের মধ্যে রাখা চলবে না। কেননা, প্রকৃতির সংসর্গ একেবারে ছাড়তে হবে।[২৬] শচীশ নাগালের বাইরে চলে গেলে দামিনী শচীশকে পূজার আসনে স্থান দিয়ে শ্রীবিলাসের প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাকেই বিবাহ করে। শ্রীবিলাস অধ্যাপনা শুরু করে, ছাত্রপাঠ্য নোটবই লেখে। কিন্তু দামিনীর মৃত্যু তাদের দাম্পত্য জীবনকে অসমাপ্ত রেখে দেয়। বৈষ্ণবীয় ধর্মসাধনায় দামিনীর মতো ইন্দ্রিয়-ক্ষুৎপিপাসু বিধবার সংস্থানের সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ এটা দেখিয়েছেন, কিন্তু শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহিত জীবন কেন হঠাৎ নির্বাপিত হয়ে গেল, কেনই বা থেকে গেল অপুষ্পক, এই প্রশ্নের সদুত্তরও উপন্যাসে নেই। সুতরাং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসকে বৈষ্ণবীয় ধর্মচর্যার নেতিবাদী সমালোচনার দৃষ্টান্তরূপেও গ্রহণ করা চলে না।

দৃশ্যত এবং বহিরঙ্গত, চৈতন্যদেব আর রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা বা জীবনাদর্শ পৃথক। চৈতন্যদেবের জীবন বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের কৃষ্ণার্তিময় এপিক। আর রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্ভোগাখ্য-শৃঙ্গারের তৃষ্ণাসক্তিময় কথাশিল্প। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের শেষপর্বে তিনি নিজেকে বাউল বলে ভাবতেন। আর চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বে অদ্বৈতাচার্য তাঁকে যে রহস্যময় তরজা পাঠান, তাতে তাঁকে বাউল বলেই সম্বোধন করেন।

**তথ্যসূত্র:**

১. বৃন্দাবন বিরচিত চৈতন্যভাগবত (সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য অকাদেমি সংস্করণ), ৩য় মুদ্রণ ২০০৩, আদি ২.১৮
২. তদেব, আদি, ২.১৭৪
৩. তদেব, মধ্য, ১.৩৫২
৪. তদেব, মধ্য, ২.৮৯
৫ 'মুক্তি', নৈবেদ্য
৬. তদেব

৭. ‘অপ্রমত্ত’, নৈবেদ্য

৮. ‘পাগল’, বিচিত্র প্রবন্ধ

৯. ‘বৈরাগ্য’, চৈতালি

১০. চৈতন্যভাগবত, মধ্য.৬.১৬৪

১১. ১০৭ সংখ্যক কবিতা, গীতাঞ্জলি

১২. তদেব

১৩. ১০৮ সংখ্যক কবিতা, গীতাঞ্জলি

১৪. ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, সাহিত্য

১৫. ‘জন্মান্তর’, ক্ষণিকা

১৬. প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য শ্রীকৃষ্ণকথামৃতে ৯২ শ্লোকে বিশ্বমঙ্গলকাব্য : মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।...

১৭. ‘সাহিত্য সম্মিলন’, সাহিত্য

১৮. তদেব

১৯. ‘বৈষ্ণব কবিতা’, সোনার তরী

২০. ‘একাল ও সেকাল’, মানসী

২১. ‘প্রশ্ন’ পরিশেষ

২২. ‘রাজপথের কথা’, গল্পগুচ্ছ

২৩. ‘জয় পরাজয়’, গল্পগুচ্ছ

২৪. ‘সমস্যা পূরণ’, গল্পগুচ্ছ

২৫. ‘মেঘ ও রৌদ্র’, গল্পগুচ্ছ

২৬. প্রসঙ্গত স্মরণীয় চৈতন্যদেবের উক্তি: ‘স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ।।’
(কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০২, মধ্য, ১১.৬.)

# বরাক উপত্যকায় রবীন্দ্র নির্মাণ : সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রকাব্য

আনন্দমোহন মোহন্ত

ভূমিকা : বিংশ শতকের প্রথম পর্বেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রান্তিক এ বরাক উপত্যকায় পৌঁছে যায়। কবিগুরুর নবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দোচ্ছ্বাস এ ভূমিতেও অনুভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখানে যেমন উচ্ছ্বাস ছিল, তেমনি ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতার হাওয়াও। তখনকার বিদগ্ধ পণ্ডিত, শিলচর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সুরমা'র সম্পাদক ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব (১৮৭০-১৯৪৩) 'সুরমা' পত্রিকার দুটি কিস্তিতে (২৬ জানুয়ারি ও ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪) গীতাঞ্জলি ও এ কাব্যের কবিকে বিরূপ সমালোচনা করেন। পাঠকের কৌতুহল হতে পারে ভেবে সমালোচনার দুটি অংশ তুলে দেওয়া হল—

(ক) 'চরণ ধূলার তলে মাথা নত করিয়া দিতে হইলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। অতএব এ স্থানে রসভঙ্গ উপলখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া রৌদ্ররসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে।

(খ) 'চোখের জলের অহঙ্কারকে ডুবাইবার শক্তি নাই। প্রমাণ ভারতীয় ষড় দর্শন ও আধুনিক রসায়ন। অতএব কবির উক্তরূপ আকাঙ্ক্ষা— ভারতীয় কবিত্বের মত্ত প্রলাপ।'

লক্ষণীয় দিক হল, এরূপ সমালোচনার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন শ্রীহট্ট মৌলবি বাজারের মুন্সেফ উপেন্দ্রকুমার কর (১৮৭৭-১৯৫৫)। 'গীতাঞ্জলি সমালোচনা প্রতিবাদ' শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করে লেখক বিশ্বকবির করকমলে শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গ করেন ৭ই আশ্বিন ১৩২১ বাংলা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, '... আমার রচনা যে আপনার মনে প্রীতির উদ্রেক করিয়াছে তাহার এই পরিচয় পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সকলের প্রকৃতি এক রকম নহে, এবং রুচিরও ভিন্নতা আছে। আমার গানগুলি যাহাদের ভালো লাগে নাই তাহাদিগকে ভাল লাগাইবার চেষ্টা করা সফল হইবে না।... এই গানগুলি আমার জীবন পথের পাথেয় —এগুলি আর কেহই যদি গ্রহণ না করেন, তথাপি আমার ইহা কাজে লাগিতেছে সেই আমার লাভ।' ১ (ক) ও ১ (খ)।

পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব গীতাঞ্জলির সমালোচনা করলেও অত্যন্ত সুখের ও গর্বের বিষয় যে এই শিলচর থেকেই গীতাঞ্জলি সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন পণ্ডিত কামিনীকুমার অধিকারী, ভাগবত ভূষণ। 'গীতাঞ্জলি-সংস্কৃতম' শিরোনামে গ্রন্থটি শিলচর রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক স্মারক গ্রন্থ রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়, দেবনাগরী লিপিতে ১৯৬১ সালে। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় বাংলা হরফে ১৯৬৪ সালে। এতে গীতাঞ্জলির নির্বাচিত পঁচিশটি সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত গান সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পণ্ডিত কামিনীকুমার অধিকারীর 'গীতাঞ্জলি-সংস্কৃতম', গ্রন্থটির খোঁজ নিতে গিয়ে অন্য আরেকটি সম্পূর্ণ গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদ আমাদের গোচরে এসেছে। সম্পূর্ণ গীতাঞ্জলির ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এমএ (ডবল) কাব্য-ব্যাকরণ-সংখ্যাতীর্থ। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী শুধু

গীতাঞ্জলিই অনুবাদ করেননি। তিনি অন্য রবীন্দ্রকাব্য সংস্কৃতে অনুবাদ করেছেন। এ ধরনের রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্কৃত অনুবাদ এ অঞ্চলে আরও রয়েছে কি না সেটি অবশ্যই অনুসন্ধানযোগ্য। বলাবাহুল্য, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রায়শই নিজের খেয়ালে কাজ করে যান, প্রচারের আলোয় আসতে চান না।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী একজন সুসাহিত্যিক। তাঁর অনেকগুলি কাব্য-নাটক প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাঁর জন্ম তদানীন্তন শ্রীহট্ট জোর মৌলবিবাজার মহকুমার অন্তর্গত ইটা পরগণার ভূমিউরা গ্রামে ১৯০১ সালে। পিতা মোহিনীচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা মহামায়া দেবী। করিমগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক, ১৯২৪ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে কাব্যশাখায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ পাশ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে বাংলায়ও এমএ পাশ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ড থেকে (১৯২৫-২৭) কাব্য, সাংখ্য ব্যাকরণেও উপাধি লাভ করেন।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বর্ণময় কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২৯ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপক রূপে। সুনামের সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে শিলচর জিসি কলেজ ও কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করেন। অধ্যক্ষ রূপে কার্যভার পরিচালনা করেন হাইলাকান্দির হেমচন্দ্র গার্লস কলেজে ও লালা রুরাল কলেজে। লালা কলেজ থেকেই তিনি ১৯৬৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনে তিনি নিরলসভাবে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সাধন করে গেছেন। ১৩৮৬ বাংলার ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০) এই কৃতী সাহিত্যিক ও অধ্যাপক পরলোক গমন করেন।

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্কৃতে অনূদিত রবীন্দ্রকাব্যের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

১. সংস্কৃত-গীতাঞ্জলি (রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতাঞ্জলির পদ্যানুবাদ)

২. সংস্কৃত-রবীন্দ্র-গীতিশতকম (রবীন্দ্রনাথের একশতটি নির্বাচিত গানের পদ্যানুবাদ)

৩. সংস্কৃত-রবীন্দ্র-কবিতাঞ্জলি : (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, সোনার তরী, পূজারিণী, উর্বশী, অভিসার, বিদায় অভিশাপ, জাতীয় সঙ্গীত, দেবতার গ্রাস ইত্যাদি পনেরোটি কবিতার সংস্কৃতে পদ্যানুবাদ)

৪. কর্ণ-কুন্তীসংবাদম (রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তীসংবাদ নাট্যকাব্যের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ)

৫. বিদায়াভিশাপম (বিদায় অভিশাপ নাট্যকাব্যের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ)

৬. গান্ধার্যাবেদনম (গান্ধারীর আবেদন নাট্যকাব্যের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর রবীন্দ্রকাব্যের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায়। (১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫), আনন্দবাজার পত্রিকায় (সোমবার, ২৫ পৌষ, ১৩৭২ বাং, জানুয়ারি ১০, ১৯৬৬), শিলচরের 'আজাদ' পত্রিকায় (সোমবার, ৮ কার্তিক, ১৩৭২ বাং), 'জনশক্তিতে (১ পৌষ, ১৩৭২ বাং)।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর এই অমূল্য সাহিত্যকর্ম আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি। প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেও তিনি অনুকুল সাড়া পাননি।

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্কৃত গীতাঞ্জলি অনুবাদটি দুটি বাঁধাই করা খাতার এক পৃষ্ঠায় লেখা। প্রথম খাতায় (পৃষ্ঠা ১-১২৩) গীতাঞ্জলির ১১১টি গানের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ। দ্বিতীয় খাতায় (১২৪-১৭৭ পৃষ্ঠায়) আছে অবশিষ্ট ৪৬টি গানের পদ্যানুবাদ। গীতাঞ্জলির কোনও কোনও গান দুইবার অনুবাদ করেছেন। একবার বাংলা ধ্বনি প্রধান ছন্দে, দ্বিতীয়বার সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দে। এই রকম দুবার অনুদিত গানগুলি হল ১, ৫ ও ২৫ সংখ্যক গান। ১ (ক) ধ্বনিপ্রধান ছন্দে এবং ১ (খ) বসন্ততিলক ছন্দে। ৫ (ক) ধ্বনিপ্রধান ছন্দে এবং ৫ (খ) মালিনী: ২৫ (ক) ধ্বনি প্রধান ছন্দ এবং ২৫ (খ) মন্দাক্রান্তা।

সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা না থাকলে রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদ করা দুরূহ— বিশেষ করে সংস্কৃত ছন্দে। ‘সংস্কৃত-গীতাঞ্জলি’ পাঠ করলে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অনুমান করা যায়। অধ্যাপক চক্রবর্তী স্বয়ং একজন কবি; তাই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবিগুরুর গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছেন তিনি। পরিশীলিত কোমল শব্দ প্রয়োগের জন্য প্রতিটি শ্লোক হয়েছে গীতিময়, সাবলীল ও সুখপাঠ্য। ভাষা প্রাঞ্জল মাধুর্যমণ্ডিত ও প্রসাদগুণসমন্বিত, শান্তরস অভিব্যঞ্জিত। অনুবাদকালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানের সুর যথাসম্ভব রক্ষা করতে প্রয়াস করেছেন। বিভিন্ন অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগ করায় শ্লোকগুলি হয়েছে শ্রুতিসুখর। সংস্কৃত-গীতাঞ্জলিতে কবি সুরেশচন্দ্র অধিকাংশ শ্লোকই সংস্কৃত ছন্দে রচনা করেছেন। কয়েকটি মাত্র বাংলা ধ্বনি প্রধান ছন্দ পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি হল— অনুষ্টুপ (শ্লোক/পদ্য), ইন্দ্রবছা, উপজাতি, প্রহর্ষিণী, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শার্দুলবিক্রীড়িতম এবং অন্ধরা।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বিভিন্ন ছন্দে অনুদিত সংস্কৃত-গীতাঞ্জলির কয়েকটি মাত্র শ্লোকের আস্বাদন নেওয়া যাক-

(ক) গানং যদ্ গাতুমায়াত
স্তন্ন গীতং ময়াত্র হি।
সাধ্যমানঃ স্বরোহদ্যাপি
গানেচ্ছা মেহি কেবলম্।।
(হেথা যে গান গাইতে আসা, আমার হয়নি সে গান গাওয়া-
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া/৩৯)

উদ্ধৃত শ্লোকটি সুন্দর অনুষ্টুপ ছন্দে অনুদিত। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটিও অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত-

(খ) অপাবৃতং কুরু দ্বারং
নভসি তিমিরাবৃতে।
মৌনং হি সপ্তলোকস্য।
সমাগচ্ছতু তে গৃহে....।।

মূল পঙক্তিগুলো

দুয়ার তোমার খুলে দাও গো
আঁধার আকাশ’ পরে
সপ্ত লোকের নীরবতা
আসুক তোমার ঘরে। ৬৪

মেঘদূতের কবি কালিদাসের অতি প্রিয় ছন্দ মন্দাক্রান্তা। সেই ছন্দটি রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয়। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সেই মন্দাক্রান্তা ছন্দে গীতাঞ্জলির কয়েকটি গান অনুবাদ করেছেন। যেমন,

পশ্যামাদ্ধা-প্রতিদিনমহং-রাজতে ভো হৃদীশ
নানারূপৈ-স্তব হি বিরহঃ-কাননে ভূধরে চ।
আকাশে বৈ-সকলভুবনে- স্বর্ণবে তদ্বদেব
পশ্যাম্যদ্ধা- প্রতিদিনমহং-রাজতে তে বিয়োগঃ।।
সংব্যাপ্যাহ্যে-সকলরজনিং-বর্ততে নীরবং হি
তারাস্বেবা-পালক নয়নং-পল্লবে শ্রাবণস্য।
ধারাপাতে ধ্বনতিসততং- বিপ্রয়োগস্তবৈব

পশ্যাম্যদ্ধা-তব হি বিরহো-রাজতে বিশ্বলোকে।।

হেরি অহরহ, তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে। ২৫

মাঝে মাঝে অন্ধরা ছন্দ ব্যবহার করে অনুবাদের চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—

শোষং যাতা যদা জীবনরসনিকরা
এহি কারুণ্যধারৈ/রস্তর্ধানং যদেতঃ
সকলমধুরিমা গীতপীযূষপাতৈঃ।
আগচ্ছ ত্বং যদা স্বনন সুমুখরৈঃ কর্মভিস্থাদ্যতে দিগ
ভো নিঃশব্দপ্রভো ম-হৃদয়-সুনিকটং শান্তগত্যা ত্বমেহি।।

মূল পঙক্তিগুলো

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো। সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো। কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার। হৃদয় প্রান্তে, হে জীবন নাথ, শান্ত চরণে এসো। ৫৮

### । ২ ।

কামিনীকুমার অধিকারীর ‘গীতাঞ্জলি সংস্কৃতম্’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে মহামান্য ভারত সরকার এর একশতটি কপি ক্রয় করে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিতরণ করেন।[২] গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হয় শান্তিনিকেতনে। অনেকেই অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ড° সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশংসা করে লেখেন—’ … These translation have been done in a very simple and lucid style, and they will appeal to persons who have even an elementray knowledge of the language.... Rabindranath in his original Bengali has been the soul of clarity and simplicity, and these two virtues of his style would sometimes be very difficult to transmit into another language. But Prof. Adhikari shows himself to be a master of Sanskrit and I have nothing but praise for the way in which he has accomplished this self appointed labour of love....’ [৩]

কামিনীকুমার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা ‘উর্বশী’রও সংস্কৃত অনুবাদ করেন।

তদানীন্তন শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার পুটিজুরি পরগণান্তর্গত যাদবপুর গ্রামে পণ্ডিত কামিনীকুমার অধিকারীর ১৮৯৫ সালে জন্ম হয়। তাঁর পিতা ব্রজনাথ অধিকারী, মাতা করুণাময়ী দেবী। পড়াশোনা করেন গ্রামের পাঠশালায়। শিলচরে সূর্যকুমার তর্কসরস্বতী মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেও অধ্যয়ন করেন। তিনি কাব্য,

ব্যাকরণ ও জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভাগবত শাস্ত্রেও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল; এজন্য তিনি 'ভাগবতভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। একজন সুবক্তা ও সদালাপী রূপে পণ্ডিত অধিকারী সুধী সমাজে আদৃত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষক হিসেবে কামিনীকুমার অধিকারী একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন।[৪] শিলচর গুরুচরণ কলেজের আদিপর্বে ১৯৩৭ সাল থেকে কলেজ গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাছাড়া সংস্কৃত বিষয় শিক্ষক হিসেবে উক্ত কলেজে তিনি শিক্ষাদান করেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ মাসোহারাও তিনি পেয়েছিলেন। পণ্ডিত কামিনীকুমার অধিকারী ৮৪ বছর বয়সে শিলচরে নিজ গৃহে ১৭ অক্টোবর, ১৯৭৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কামিনীকুমার অধিকারী গীতাঞ্জলির ১৫৭ টি গানের মধ্যে পঁচিশটি গানের সংস্কৃতে ছন্দোবন্ধ অনুবাদ করেন। উল্লেখ্য যে, অনুবাদে গীতাঞ্জলির ক্রম অনুসৃত হয়নি। 'গীতাঞ্জলির-সংস্কৃতম্' গ্রন্থে ধারাবাহিক ক্রমে নিম্নোক্ত গানগুলি গৃহীত হয়েছে—

(১) আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার (১)/(২) এই করছে ভালো, নিঠুর (৯১)/(৩) বিপদে মোরে রক্ষা করো (৪)/(4) জীবনে যত পূজা (১৪৭)/(৫) তোমার প্রেম যে বইতে পারি (৬৬)/(৬) অন্তর মম বিকশিত করো। (৫)/(৭) আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই (২)/(৮) শরতে আজ কোন অতিথি (৩৮)/(৯) নিন্দা দুঃখে অপমানে (১২৬)/(১০) তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে (৭)/(১৩) হেথা যে গান গাইতে আসা আমার (৩৯)/(১৪) সে যে পাশে এসে বসেছিল (৬১)/(১৬) জগৎ জুড়ে উদার সুরে (১৫)/(১৭) তব সিংহাসনের আসন হতে (৫৬) (১৮) সভা যখন ভাঙবে তখন (৭৫) (১৯) ছিন্ন করে লও হে মোরে (৮৭) (২০) জীবন যখন শুকায়ে যায় (৫৮) (২১) জননী, তোমার করুণ চরণখানি (১৪) (২২) প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে (২৮)/(২৩) হেরি অহরহ তোমারি বিরহ (২৫)/(২৪) তোরা শুনিস নি কি, শুনিস নি তার (৬২)/(২৫) গর্ব করে নিই নে ও নাম, জান অন্তর্যামী (১১১)।

সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী কামিনীকুমার অধিকারী 'গীতাঞ্জলি সংস্কৃতম'-এর প্রারম্ভে 'কবিমঙ্গলম্' নাম দিয়ে শাদুল বিক্রীড়িতম্ ছন্দে রচিত ছয়টি শ্লোকে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি আদি কবি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, ভাস, শ্রীহর্ষ, আচার্য দণ্ডী, ভর্তৃহরি, জয়দেব, মাঘ, ভট্টি, শূদ্রক ও বিষ্ণু শর্মাকে বন্দনা করেন। সঙ্গে গীতাঞ্জলির রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরিশেষে অধিকারী লেখেন, শক্তি থাকলে অন্য ভাষার কাব্যের অনুবাদ সম্ভব। তবে পদলালিত্য কীভাবে সুমধুর হয় সেই দিকেই যত্ন নেওয়া কর্তব্য। কবিরই পুষ্পের দ্বারা কবিকেই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করলেন। বিদ্বানেরা গুণের লেশমাত্রেই তুষ্ট হন। তাঁরা আপন গুণের দ্বারা যেন তাঁর এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পূর্ণ করেন। শার্দুল বিক্রীড়িতম্ ছন্দে রচিত ভাবগম্ভীর প্রসাদগুণমণ্ডিত শ্লোকটি লক্ষণীয়—

শব্দানামনুবাদনং ভবতি বৈ শক্ত্যা তদর্থান্বিতং
রাগাণামিহ তৎ কথং নু ভবিতা তস্মিন্ প্রয়াসঃ কুতঃ।
তদ্দত্তৈঃ কুসমৈরথো কবিগুরাবেষ প্রণামাঞ্জলি-
—বিদ্বাংসেবা গুণলেশমাত্রসুখিনঃ সম্পূর্যতাং স্বৈ গুণৈঃ।।

গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানই শান্তরসময় বৈরাগ্যভাবের দ্যোতক ঈশ্বরসত্তার প্রতি আত্মনিবেদন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কামিনীকুমার অধিকারী গানগুলি অনুবাদ করতে গিয়ে পদলালিত্যময় শব্দপ্রয়োগ করেছেন রসোপযোগী করে। ভাষা হয়েছে প্রাঞ্জল, শব্দ শোনামাত্রই অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বভাবতই শব্দালঙ্কারের মধ্যে বিভিন্ন অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগ করে শ্লোকগুলি নন্দিত, ঝঙ্কৃত করেছেন। অবশ্য কবির প্রযুক্ত অর্থালঙ্কারের আশ্রয় নেননি। শান্তরসের অনুকূল শব্দ প্রয়োগের জন্য অধিকারীর অনূদিত শ্লোকগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে

মাধুর্যগুমণ্ডিত, কোথাও বা প্রসাদগুণমণ্ডিত হয়ে গীতিকাব্যের রূপ নিয়েছে। শ্লোক রচনায় সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দের মধ্যে ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বসন্ততিলকম্ ও মালিনী ছন্দের নিপুণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশির ভাগই বাংলা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। গীতাঞ্জলির গানের তাল অর্থাৎ সুরের ছন্দ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে কামিনীকুমার অধিকারী অধিকাংশ স্থলে বাংলা ধ্বনিপ্রধান ছন্দেরই আশ্রয় নিয়েছেন। কামিনীকুমার অধিকারীর 'গীতাঞ্জলি সংস্কৃতমের' কয়েকটি পদলালিত্যময় শ্লোকের আস্বাদন নেওয়া যাক—

(১) সুষ্ঠু কৃতং মে সুষ্ঠু কৃতং মে
সুষ্ঠু কৃতং মম নির্দ্দয়।
ইত্থং হৃদি মম তীব্রং দহনং
জ্বালয় হে ত্বং জ্বালয়।।

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছে ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো। ৯১

(২) মানসকুসুমং সুবিকাশয় মে
মানসপুর-সুখশায়িন্।
কুরু নির্মলমপি ভাস্বরতরমপি
কুরু সুন্দরতরমপি হে।।

অন্তর মম বিকশিত করো।
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে। ৫

(৩) কোহয়ং দ্বারমুপেতঃ
প্রাণানাং মে শরদি।
আনন্দগীতমুদ্গাহি হৃদয়
গীতমানন্দং গাহি।।

শরতে আজ কোন অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দ-গান গা রে হৃদয়,
আনন্দ গান গা রে। ৩৮

নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে অনুপ্রাস অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগের জন্য শব্দঝঙ্কার অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর—

(৪) অজ্ঞাতাঃ শতশঃ কৃতাঃ পরিচিতা
দত্তাঃ শতৈ রাশ্রয়াঃ।
দুরস্থা নিকটীকৃতাঃ পর ইতি
খ্যাতাঃ কৃতা ভ্রাতরঃ।।

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।৩

ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত প্রসাদগুণময় একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েই এই আলোচনা শেষ করছি—

শুষ্কং যদা স্যাম্মম জীবনং হে
নিঃশেষ মাধুর্যরসং যদা স্যাদ্
এহোহি গীতেন সুধারসেন।।

মূল পঙ্ক্তি :

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো। ৫৮

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই প্রান্তীয় অঞ্চলের অনুবাদক কামিনীকুমার অধিকারীর অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ অনুবাদটি এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এই পাণ্ডুলিপির প্রকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সার্ধশতবর্ষে কবিগুরুর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হবে বলে আমি মনে করি।

**তথ্যসূত্র :**

১) (ক) রবীন্দ্রনাথ আরু অসম, ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, লয়ার্স বুক স্টল, পানবাজার, গুয়াহাটি-১; ২০০১
১) (খ) A. File on Silchar Town 1833-1947, Dr. Amalendu Bhattcharjee Dr. Jahar Kanti Sen, Published by Dasharupak, UD Sarani, Silchar, 788004, 1997
২) ভূমিকা, গীতাঞ্জলি-সংস্কৃতম, দ্বিতীয় সংস্করণ, পণ্ডিত কামিনীকুমার অধিকারী, শিলচর, রাঙ্গিরখাড়ি, ১৯৬৪
৩) ঐ
৪) সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান, কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩g

# আমাদের রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্যের চারণক্ষেত্রে কবিগুরু

## তুষারকান্তি নাথ

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কল্পনা ও আদর্শের অনুবর্তী হলেও তাঁর কল্পনা স্বদেশ ও লোকজীবনকে ত্যাগ করে সুদূরস্পর্শী হয়নি। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যকে আশ্রয় করেই তাঁর বিশ্বযাত্রার সূচনা এবং 'বিশ্বকবি' হয়ে ওঠা। রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চা প্রসঙ্গে একালের দু'জন লোকসংস্কৃতিবিদ যথার্থই বলেছেন, 'একদিকে পশ্চিমাগত নব সাহিত্যতত্ত্বে দীক্ষা, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শের মহিমা তথা কালিদাসাদির কাব্য-কল্পনায় অবগাহন। এই সব ঐশ্বর্যের মধ্যেও তিনি মাটির কাছের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ বোধ করলেন, যে সংস্কৃতি দরিদ্র এবং অনুজ্জ্বল, অনভিজাত এবং অবহেলিত। রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির প্রতি কৃপার দৃষ্টিতে তাকাননি। তিনি এই সব ভাবনাকে অপরিহার্য মনে করেছেন। হঠাৎ একটি প্রবন্ধ লেখা বা কোন মন্তব্য করা নয়, তিনি ৫৭ বছর ধরে এই ভাবনা-বৃত্তের বাইরে যাননি। ছন্দ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে, বাংলা ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে, ছাত্রদের উপদেশ ও অনুপ্রেরণা দানকালে, দেশের রাজনীতি বিশ্লেষণ উপলক্ষে, দেশ-বিদেশে মানবধর্মের চিরন্তন তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যকে মুহুর্মুহু স্মরণ করেছেন। বিষয়টি তাঁর জীবনবোধের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।'[১] রবীন্দ্রনাথ শুধু লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, আত্মোল্লাসে উদ্ভাসিত পদ্ধতিতে সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন যখন এদেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি ছিল অজ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মর্তব্য : 'রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর পিতা তাঁদের পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের জমিদারীর কার্য দেখাশোনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তা ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভা উন্মেষের এক পরম সুযোগ হলেও বিশেষভাবে বাংলার লোকসাহিত্যের যথার্থ প্রয়োগ-ক্ষেত্রটি নিজের চোখে দেখবার এবং নিজের কানে শুনবার সুযোগ পেলেন।[২] আমরা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অপরিমেয় ভাণ্ডারের মধ্যে লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির বিপুল উপাদান অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের কাব্য থেকে শুরু করে জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেসব কাব্য রচনা করেছেন, তার সকল পর্বেই লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রেরণা সক্রিয় ছিল। বাঙালির ভুবনে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথা তাঁর কবিতার ভুবনে, কল্পনার ভুবনে এসে ভিড় করেছে নব নব রূপে বারবার। রূপকথার রাজার কল্পিত রাজপুরী, রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যা, দুয়োরানী, সুয়োরানী, নাগকন্যা, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র, সাত সাগরের তীর, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার, সাতভাই চম্পা আর পারুল দিদি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ, সোনার কাঠি, পরী, পরীর দেশ, যক্ষীবুড়ী, ডাইনিবুড়ী, কাঠকুড়ুনি, দৈত্যপুরী, পাতালপুরী ইত্যাদি ছিল তাঁর কাব্যসাধনা, কল্পনাশক্তি ও কবিপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রেরণা। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

মজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র 'নীলকমল আর লালকমল'-এর মুগ্ধতার আবেশ এবং প্রভাব থেকেও রবীন্দ্রনাথের নিষ্কৃতি ছিল না। শুধু কাব্যে নয়, তাঁর নাটক, গান, ছোটগল্প ইত্যাদিতেও লোকসাহিত্যের নানা বিষয় ও ভাবনা ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর লেখায় মৌখিক ঐতিহ্যের উপাদানসমূহ যেমন— ছড়া, গান, উপকথা, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (ইডিয়াম), প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শ্রুতিরূপ ধরা পড়ে বারবার। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোক-উৎসব, লৌকিক ধর্মাচার, মেয়েলি ব্রত ইত্যাদির প্রতিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিস্তার লাভ করেছিল। লৌকিক বাংলার নিজস্ব সুর বাউল, সারি, ভাটিয়ালি, তরজা, পাঁচালি, কীর্তন ইত্যাদিও রবীন্দ্রনাথের গানের ভেলায় আশ্রয় নিয়েছে। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি তাঁর এক মহান কীর্তি। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের লোকজীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা যে অপরিমেয় ছিল তা বোঝা যায়। 'সাধনা', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'ভারতী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় এবং 'ছিন্নপত্র', 'পিতৃস্মৃতি' ও 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে ছড়া-লোকসাহিত্য-লোকসংগীতের প্রভাব তাঁকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেকথা আমরা জানতে পারি।

। ২।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং লিখেছেনও প্রচুর। তাছাড়া, 'রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহই এদেশে সর্বপ্রথম ছড়ার সংগ্রহ।... ভারতের অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষাতেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেউ ছড়ার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হননি।'[৩] তিনি একাধারে ছড়ার সংগ্রাহক এবং বিদগ্ধ বিশ্লেষকও। ছড়াগুলোতে সমাজভাবনাও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। এগুলো যে নাগরিক সভ্যতার চাপে কালের গহ্বরে হারিয়ে যেতে বসেছে তাও রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক উপাদান এগুলোর মধ্যে সুপ্ত বা বিক্ষিপ্তভাবে থাকতে পারে, তা তিনি বুঝেছিলেন। 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছেন, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে।'[৪] বস্তুত ছড়াগুলোর যে ভাষাতত্ত্বগত ও সমাজতত্ত্বগত মূল্য আছে, এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ মোটেই উদাসীন ছিলেন না।

ছড়াগুলো কোনও বিশেষ একটি অঞ্চলের সম্পত্তি নয়, এগুলো মুখ থেকে মুখান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করে। বাক্-আশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির পরিব্যাপ্তি ও পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিক ব্যাপার। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তার ধারাটি থাকে বহমান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। কারণ, এই কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা দেশকালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।'[৫] 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ৮১টি ছড়া তাঁর সংগ্রহ থেকে তুলে ধরেছেন। এগুলোর মধ্যে চারটি ছড়া ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলের কোনও অধিবাসীর নিকট থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন।[৬] আজকের লোকসংস্কৃতিবিদরা লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ সংগ্রহ-চর্চা-গবেষণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই তা ভেবেছিলেন— 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'[৭]

রবীন্দ্রনাথ কখনও শিলচর-কাছাড়ের মাটিতে পদার্পণ করেননি* এবং এখানকার লোকসাহিত্যের কোনও উপাদান সংগ্রহ করেননি বলে একটা আক্ষেপ শোনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে চারটি ছড়া সংগ্রহ করেছেন এবং ঢাকা-বিক্রমপুর আমাদের নিকট প্রতিবেশী তো বটেই। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গভূমির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলভূমিকে (মেঘনা-সুরমা-বরাক উপত্যকা) আমরা একটি 'সাংস্কৃতিক বলয়' বা 'culture zone' বলে অভিহিত করতে পারি। নীহাররঞ্জন রায় স্পষ্ট করেই বলেছেন— 'বরাক ও সুরমানদীর উপত্যকা তো মেঘনা উপত্যকারই (ময়মনসিংহ-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র।... এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাংলার এই জেলাগুলির সঙ্গে সঙ্গে'।[৮] রাজশাহী-পাবনা অঞ্চলের শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে জমিদারি পরিচালনা উপলক্ষে যাতায়াত এবং ১৯১৯ সালে শ্রীহট্ট ভ্রমণে আসার ফলে পূর্ববঙ্গ ও তার পূর্বতম প্রান্তের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির মর্মকথা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— 'কলকাতায় বসে এ বাংলাদেশকে দেখতে পাওয়া যায় না। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে কবির মনে বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তি প্রশস্ততর হতে থাকে।'[৯]

। ৩।

দক্ষিণ আসামের সুরমা-বরাক উপত্যকা তথা কাছাড়ের আজকের দিনের বরাক উপত্যকার, সাংস্কৃতিক আত্মার সঙ্গে রবীন্দ্রজীবন ও তাঁর অন্তরের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটেছিল নানাভাবে। রবীন্দ্রালোকে কাছাড়ও যথেষ্ট উদ্ভাসিত। কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই অঞ্চলভূমির সর্বপ্রথম যোগাযোগ। প্রখ্যাত আইনজীবী কামিনীকুমার চন্দ কাছাড়ের বালাধন চা বাগানের একটি মোকদ্দমায় নিরপরাধ মণিপুরি যুবকদের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে লড়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। পরবর্তীকালে কামিনীকুমার ও তাঁর পুত্রদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কামিনীকুমার ভারতীয় রেলের কৌঁসুলি ছিলেন এবং তাঁকে রেলযোগে ভ্রমণ করতে হতো। কামিনীকুমারের সেই পরিচিতির সঙ্গে 'শিলচর' স্থাননামের মেলবন্ধন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'রেলচর'।[১০] এতে বোঝা যায়, কৌতুকচ্ছলে 'লোকনাম' ও 'স্থাননাম' গঠনে বাঙালি লোকসমাজে যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তা-ই অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়টি লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি পর্যায়।

শিলচরের 'চন্দ পরিবার'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক-আন্তরিক সম্পর্কের কথা বারবার আমাদের স্মরণ করতে হয়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কাছাড়প্রাণ অরুণকুমার চন্দের কন্যা জয়শ্রীর খাতায় লিখেছিলেন—

'হেলা ভরে ধুলার পরে
ছড়াই কথাগুলো
পায়ের তাল পলে পলে
উড়িয়ে হয় ধুলো।'[১১]

লক্ষণীয় বিষয় হল, লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সকল কাব্যগ্রন্থেই অল্পাধিক ব্যবহার করেছেন এবং এক্ষেত্রেও তা-ই। ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই।'[১২] এই লৌকিক ছন্দের ধারাকে আজীবন অবলম্বন ও লালন করে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কবিতা রচনা করে

---

* ১৯১৯ সালের ৫ নভেম্বর কবি রেলগাড়িতে বদরপুর-করিমগঞ্জ হয়ে সিলেট যান। করিমগঞ্জে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয় এই রেল স্টেশনেই। আজকের কাছাড় নয়, তবে তদানীন্তন কাছাড়ে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ অবশ্য হয়েছিল।

একে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

আর এ ভুবনের অন্যতম জনগোষ্ঠী মণিপুরিদের যে প্রথাগত নৃত্যকলা রবীন্দ্রমানসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, এটা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কবিগুরুর শ্রীহট্ট আগমন শ্রীহট্ট-কাছাড় ও সন্নিহিত অঞ্চলের মণিপুরি নৃত্যের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। মণিপুরি নৃত্যের ব্যাপক অনুশীলন ও প্রসারে তাঁর এই সফর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মণিপুরি নৃত্যের খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী। শ্রীহট্টে মণিপুরি নৃত্য দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, শিলচর, ইম্ফল থেকে বহু নৃত্যশিক্ষক মণিপুরি নৃত্যধারাকে শান্তিনিকেতনে প্রসারিত ও উদ্ভাসিত করে গেছেন। শিলচরের ব্রজবাসী সিংহ ও সেনারিক সিংহের মতো মণিপুরি নৃত্য-শিক্ষকের নামও এক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একথা তো সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনৃত্য তথা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলোর নাচও মণিপুরি নৃত্যের আঙ্গিকের ওপর গড়ে উঠেছে, যে নৃত্যকলার উদ্ভব এ লৌকিক স্তরেই।

আমাদের লোকঐতিহ্য-লোকসংস্কৃতিকে বুঝতে হলে, আমাদের আত্মপরিচয়টিকে সঠিকভাবে জানতে হলে লোকসংস্কৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথের মনন-বিশ্বের এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

**তথ্যসূত্র :**

১. লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ক্ষেত্র গুপ্ত, সনৎকুমার মিত্র (সম্পা.), ১৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৮ (আভ্যন্তর পাঠ)
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২৩
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, কলকাতা, ১৯১১, পৃ. ৫
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৬৯
৯. প্রমথনাথ বিশী, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৪২
১০. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও অসম : সম্পর্কের খতিয়ান (প্রবন্ধ), কোরক, শারদ ১৪১৭, কলকাতা, পৃ. ১৫
১১. যুথিকা দাস, রবীন্দ্রভুবনে সুরমা ও বরাক (প্রবন্ধ), স্মরণিকা, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, দ্বিষষ্টিতম অধিবেশন, শিলচর, ১৩৯৬, পৃ. ৪১
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছড়ার ছবি, আশ্বিন ১৩৪৪ (ভূমিকা); ক্ষেত্র গুপ্ত ও সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত ‘লোকসংস্কৃতি গবেষণা’ পত্রিকা, ১৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৪০৯, পৃ. ৬৪১ থেকে গৃহীত

# রবীন্দ্র-আলোকে সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাস-চেতনা

## সঞ্জীব দেবলস্কর

রবীন্দ্র-সম্পর্কধন্য আসাম, অর্থাৎ দেশবিভাগ-পূর্বকালীন অখণ্ড আসামরাজ্যে কবিগুরুর সান্নিধ্যে আসা মানুষজন, রবীন্দ্র-চেতনায় অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং রবীন্দ্র-চেতনার সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন উষারঞ্জন ভট্টাচার্য অসমিয়া এবং বাংলা দুই ভাষাতেই। তা ছাড়াও ইতিপূর্বে সুরমা-বরাক উপত্যকার সুসন্তান সৈয়দ মুজতবা আলী— যাঁর জন্মস্থান অখণ্ড আসামের করিমগঞ্জ, যে-করিমগঞ্জের মাত্র একটি খণ্ডিত অংশই এসেছে ভারতবর্ষের ভাগে— সেই কথাকার আলী সাহেবের সিনেমায় অসংখ্যবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে, অনুষঙ্গে পর্যাপ্তভাবে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, এ-ইতিহাসকে বুকে লালন করে আজও নির্বাসিতা নদীর তীরে বেঁচে আছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। আবার রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে আসামে ভাষারাজনীতি, বিভিন্ন ভাষিকগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃকলহ, কাছাড়ে পুলিশের গুলিতে একাদশ তরুণ-তরণীর শহিদত্ব বরণ, রাজ্য ভাষা আইনের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ, বিভিন্ন স্থানে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে জাতিসত্তার বিকাশ এবং নিজ মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনার স্ফুরণ— এর যুক্তিনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ আজও হয় ওঠেনি। আসামের বৌদ্ধিক পরিবেশ এ-ধরনের চিন্তাচর্চার জন্য যথেষ্টভাবে উদার হয়ে উঠতেও পারেনি। ইতিমধ্যে ২০০১ সালে (একুশে ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রপুঞ্জ নির্দেশিত ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালন শুরু হলে একদিকে যেমন প্রতিনিয়ত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া বিশ্বের ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অনেক বৃহৎ ভাষিক গোষ্ঠীরও অধিকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধতা লাভ করে, অন্য দিকে নানা জটিলতার আবর্তে নিমজ্জিত, হয়তো-বা কিছুটা ভ্রান্তির কুহেলিকায় আবরিত আসাম তথা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি গোপন ভালোবাসার ক্ষেত্রটিতেও ঘটেছে নতুন আলোর উদ্ভাসন। এরই প্রেক্ষিতে ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক রচনা পাঠে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতিই এ-নিবন্ধ রচনায় অনুঘটকের কাজ করেছে।

এ-রকম অনেকেরই হয়, ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত নানা বিপন্নতার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন শেষ আশ্রয়। এর প্রমাণ তো এ-ভারতীয় উপমহাদেশে জাতপাত, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হিংসা-বিদ্বেষের বিষবাষ্পে জর্জরিত প্রতিবেশী ভূখণ্ডে আমরা পেয়েছি, যে-ভূখণ্ডটি রবীন্দ্রনাথের গানকে সম্বল করে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রাণিত হয়ে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। প্রকৃতই মানুষ নিজেদের সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, কিংবা চিন্তায় নিজেকে খুঁজে পেয়েছে বার বার। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল কাছাড় অর্থাৎ আজকের বরাক উপত্যকার এক বিপন্নতার মুহূর্তে, যখন সামাজিক উত্তেজনার বশে কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদী তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের ভ্রান্তপাঠ নির্ভর একটি তত্ত্বকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষিক

অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যাঁরা আড়াইশো বছর পূর্বেকার কাছাড় রাজসভাশ্রিত এক কবির কাব্যভাষাকে বাংলাই নয় বলে দাবি করেছিলেন। সেদিন আহত, বিমূঢ় সুজিৎ চৌধুরী আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রগানে— 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে'—। কবিগুরুর শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমের গানের একটি কলির বুকের ভেতর যে এত আগুন লুকিয়ে ছিল তা উনিশশো অষ্টাশির আগে কি কেউ বুঝতে পেরেছিল? প্রাচীন কাছাড় বা হেড়ম্ব রাজসভার কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি বিরচিত সেই পঙক্তিগুলো ছিল এরকম—

*'ক্ষিরোদ তনয়া দেবী ভকত বৎসলা*
*না বুঝিয়া মূঢ় লোকে বলে চঞ্চলা' ['শ্রীনরদী রসামৃত']*

ভাষা সম্প্রসারণবাদী পণ্ডিতম্মন্যদের উদ্দেশ্যে সুজিৎবাবু বলেছিলেন,

> বাংলা কবিতায় যে নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদের আগে অহরহই বসে, এ-খবরটি শ্রীযুক্ত.... নেননি। নিলে ভালো করতেন, নইলে খোদ রবীন্দ্রনাথও নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহার করার সুবাদে সমজাতীয় সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে যাবেন। কারণ কে না জানে যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে'... এমন-কি যে-দুটি শব্দপ্রয়োগের জন্য কাব্যরচনার আড়াইশত বৎসর পরও বাচস্পতি মশাই-এর রেহাই মিলছে না, সেই 'না বুঝিয়া' শব্দ দুটিও চলিত রূপে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন : 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে'।

এর পরের বাক্যটি কেমন বিষাদময় 'না বোঝাটা কার জানি না, আঁখিজলে অবশ্য আমরাই আজ ভাসছি।' রবীন্দ্রগানের গভীর গোপনে না-বলা বাণীর এক ঘন যামিনী রয়েছে, যেখানে আছে জ্বলো-জ্বলো অস্ফুট তারার বিচ্ছুরিত তাঁপ। এ তাপ এসে পৌঁছেছে এই সমাজবিজ্ঞানীর গায়ে। এ-আগুন তিনি ছড়িয়ে দিলেন সবখানে, এ-আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে ভিটেহারা, গৃহহারা, ভাষাহারা শ্রীহট্ট-কাছাড় অর্থাৎ নির্বাসিতা বাংলাকে দহনদানে পুণ্য করার দায়িত্ব নিলেন। ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে আতঙ্কিত সেদিনের বরাক উপত্যকা তাঁর উদ্ধৃত এ-গানের করুণ সুরের মধ্যেই পেয়েছিল উজ্জীবনের মন্ত্র, 'কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।'

### । ২ ।

এ-রকম আরেকটি বহুশ্রুত, বহু উদ্ধৃত রবীন্দ্রবাণীতে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন সুজিৎ চৌধুরী। রবীন্দ্রকাব্যসম্পর্কধন্য বাংলার সম্প্রসারিত উত্তরাংশ, সুরমা-বরাক উপত্যকা অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চল যে আক্ষরিক অর্থেই নির্বাসিতা বাংলা, এ-উপলব্ধি সুজিৎ চৌধুরীকে 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করতে প্রাণিত করেছে। কবিগুরুর সেই উজ্জ্বল পঙক্তিগুলো এ-রকম—

'মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালির হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধা তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরকাল তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।'

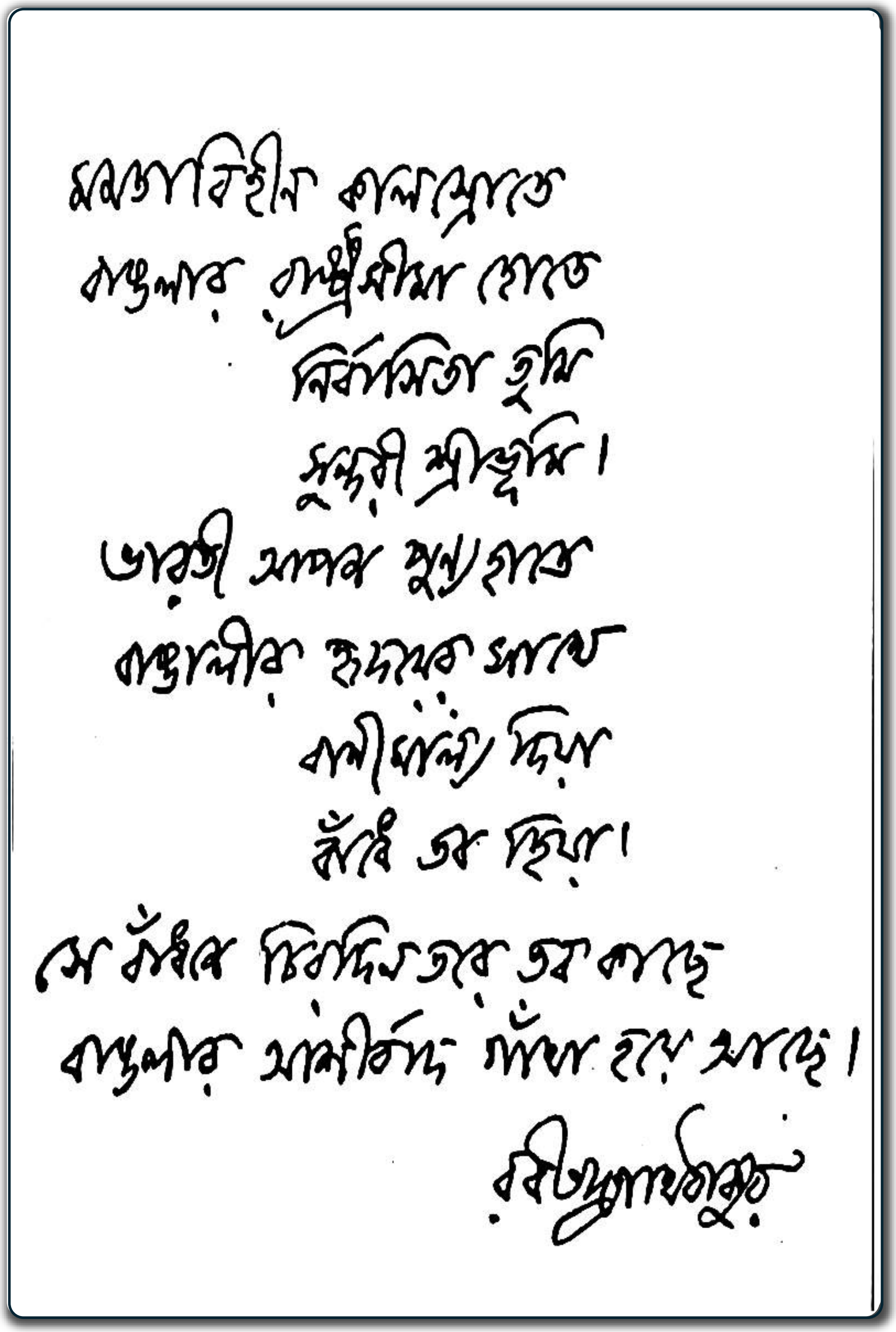

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— কবিগুরু সঠিক কবে এ-পঙক্তিগুলো লিখেছিলেন, এ নিয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। কবি শ্রীহট্টেরই এক অনুরাগীর খাতায় পঙক্তিগুলো লিখে দিয়েছিলেন, এর একটি ফ্যাক্সিমিলি কপিও সংগ্রহ করা গেছে।

ফ্যাক্সিমিলি কপিতে স্বহস্তে লিখিত কবিতাটিতে কবি যে স্বাক্ষর করেছেন এতে তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নয়। এনিয়ে কথাপ্রসঙ্গে উষারঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কবে থেকে 'শ্রী'-হীন হলেন এটা নিরূপণ করলে এ-কবিতার রচনাকাল নির্ধারণ করার প্রাথমিক স্তরটি পেরোনো সম্ভব। তা ছাড়াও এখানে বাঙলার, হোতে, বাঙালী শব্দের বানান দেখেও বোঝা যায় কবিতাটি নির্দিষ্টভাবে ১৯৩৫ সালের পূর্বের, কারণ কে না জানে রবীন্দ্রনাথ ওই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানান সংস্কারের কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছেন। সে যা-ই হোক, কবিতাটির কাল নিরূপণ না-হলেও কবিতাটি যে সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাস-অন্বেষার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে তা বললে অত্যুক্তি হবে না। উপসংহার নিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থে একটি leit motif হিসেবে কবিতাটির প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ অবস্থায় একজন ইতিহাসবিদের কি যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা সম্ভব? আমরা জানি ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ লিপসন সাহেবের কথা, যিনি ইউরোপের ইতিহাস লিখলেও ইংল্যান্ডের ইতিহাস লিখতে রাজি হননি, কারণ তিনি স্বীকার করেছেন, 'আই অ্যাম আ ন্যাশনালিস্ট'। একজন স্বঘোষিত জাতীয়তাবাদীর পক্ষে নিজ দেশের ইতিহাস লেখা ওই ইতিহাসবিদের বিবেচনায় সমস্যাজনক ছিল। তবে সেদিনের ইংল্যান্ড তো আর একজন মাত্র লিপসন সাহেবের হাতের দিকে চেয়ে বসে ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বরাক উপত্যকার পক্ষে এ ধরনের বৌদ্ধিক বিলাসিতার অবকাশ ছিল অকল্পনীয়, সে ছিল ভিতরে বাহিরে নির্বাসিত। প্রায় নব্বই বছর আগে অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি দুই খণ্ডে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' রচনা করার পর এটা প্রায় জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, আসাম রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তৃত এই ভাষিক অঞ্চলটির ইতিহাসের সমস্ত সম্ভাবনা তত্ত্বনিধিতে এসেই শেষ হয়ে গেছে। সুজিত চৌধুরী এ-সম্ভাবনার পথ খুলে না-দিলে আসামের দক্ষিণাঞ্চলটি ইতিহাসের পরিশিষ্ট থেকে মূল পৃষ্ঠায় স্থান পেতে আরও বিলম্ব হত।

সুজিৎ চৌধুরী যে-ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন এ-ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের সেই 'নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র' নয়। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নিবন্ধে (রবীন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৭০৩-৭০৯) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এতে 'কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়ে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল....' এ ইতিহাসের ধূম্রজালে 'পল্লির গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান।' এ-উপলব্ধি সুজিৎ চৌধুরীরও ছিল। তাঁর 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' পড়লে প্রকৃতই অনুভব হয় আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে বিলগ্ন...

> বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনও ছিল, নইলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর (পড়ুন শাহজালাল) নানক, চৈতন্য (পাঠকরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন শ্রীহট্ট-কাছাড় আসলে শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি, লীলাভূমিও বটে), তুকারাম (পড়ুন রাধারমণ-হাসন রাজা) ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা (পড়ুন প্রাগজ্যোতিষপুর-মুর্শিদাবাদ-মাইবং-খাসপুর) ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও (পড়ুন ঢাকাদক্ষিণ, কামাখ্যা, ভুবনতীর্থও) ছিল।

সুজিৎ চৌধুরী দক্ষিণ আসামের ইতিহাস-বিবর্জিত অঞ্চলটিতে খ্রিস্টপূর্ব শতকে আর্যাবর্তের

আত্মপ্রকাশ, কৃষি-সংস্কৃতির বিস্তারের ধারাটি যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনই এ-অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ আদি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, বা অ্যালপাইন, মঙ্গোলীয়, ভোটব্রহ্ম এবং আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠীর বিচরণের ধারাটি অনুসরণের প্রয়াসও পেয়েছেন। তিনি যেন কবি কথিত সেই 'প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করার' ঐতিহাসিক আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। 'মমতাবিহীন কালস্রোতে' যে-ক্ষমতার রাজনীতি ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে নিজ সংস্কৃতির উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বাংলার রাষ্ট্রসীমা থেকে নির্বাসিত করেছে— এর অভিঘাতেই এক সংবেদনশীল অন্ত্যবাসীকে করে তুলেছে একজন ইতিহাসবিদ, তাঁকে যুগিয়েছে অনন্য শক্তি। কবিগুরুর ভাষায়, 'যে আঘাত করিতেছে, সেই আঘাতে স্বদেশকেই .... নিবিড়ভাবে উপলব্ধি' করতে অনুপ্রাণিত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'প্রবাসে নির্বাসনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাত্ম্যকে মহত্তম করিয়া তুলিবে, — এ ছিল আগামী দিনের ইতিহাসবিদের কাছে কবিগুরুর দাবি। সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাসগ্রন্থ পাঠ সমাপনান্তে যদি কোন নির্বাসিত পাঠকের বুক ভেদ করে উৎসারিত হয় রবীন্দ্রগান—

> 'তব জীবনের আলোকে জীবন প্রদীপ জ্বালি
> হে পূজারি আজ নিভৃতে সাজাব তোমার থালি—'

তবে ইতিহাসতত্ত্ববিদরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু যাঁদের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন ইতিহাসবিদ সুজিৎ চৌধুরী অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত পথই। তাঁর ইতিহাসগ্রন্থের প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঠাকুরপরিবার : প্রাক্-রবীন্দ্র থেকে রবীন্দ্রোত্তর পর্ব : ইতিহাসের সূত্র সংকেত

**বিবেকানন্দ মোহন্ত**

ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার মহাকাশে নবজাগরণের যে উন্মেষ ও বিস্তার ঘটেছিল সেখানে এককভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারেরই উপস্থিতি ছিল এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে। সে প্রসারণের মাত্রাটি শুধুমাত্র বাংলার পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্ষেত্র বিশেষে দূর চক্রবাল রেখা অতিক্রম করে সেটি প্রভাব বিস্তার করেছিল উত্তরপূর্বের মহাকাশেও। সাহিত্য সাধনার পূজারী এবং পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অগ্রদূত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন পর্ব থেকে শুরু করে উত্তর প্রজন্মের হাত ধরে সে আত্মিক বন্ধনটি এগিয়েছিল বহুদূর এবং তার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা নিহিত ছিল জোড়াসাঁকোর মহাকাশে। বলাবাহুল্য, নবজাগরণ পর্বের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুরোধা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আসামের নিবিড় বন্ধন উভয় অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

সোনার তরী প্রভাবিত 'সোনোয়ালি জাহাজের' স্রষ্টা, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারজয়ী অধ্যাপক ভবেন বরুয়া তাই লিখছেন–

> ...the matrimonial relation between the two Assamese families with the Tagores did much to strengthen a line of conciousness, in the field of modern Assamese culture and it may be identified as Brahmo-Vaishnava type of conciousness — of which both these Assamese sons-in-law of the Tagore became particular representatives.
>
> *(Literary and cultural Relations between Assam and Bengal during 19th and 20th centuries)*

এখানে উল্লেখ্য যে, সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সহধর্মিণী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী এবং হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১৮৯১-র ১১ মার্চ এ সম্বন্ধের পর ১৯০৬ সালের ১ জুলাই অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল 'আসাম-বন্ধু'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার (১৮৩৪-'৯৪) পরিবারের সঙ্গেও। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা দেবীর বিয়ে হয়েছিল। এরও বেশ কিছুকাল আগে ১৮৮৩ সালের প্রথমদিকে গুণাভিরামের লাবণ্যময়ী কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের সম্বন্ধের কথাবার্তা এগিয়েছিল অনেকটা এবং তাতে কবিরও সায় ছিল। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের মত ছিল, তাই তিনি লিখছেন, 'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক সুবর্ণতুলির তব পুরস্কার'। কিন্তু মহর্ষির সায় না থাকাতে আলাপটি এগোয়নি

বেশিদূর। স্বর্ণলতার ঘনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানদাভিরাম বিষয়টি যে মেনে নিতে পারেননি তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর আত্মজীবনী 'মোর কথা'তে। বরুয়া লিখছেন—

'ভগবানের কি ইচ্ছা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বড়দিদির বিয়ে হল না, কিন্তু বড়দিদির ছোটভাই আমার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞ দার্শনিক বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজো ছেলে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা দেবীর বিয়ে ১৯০৬ সালের ১ জুলাই অনুষ্ঠিত হল। মানুষের মতের কত পরিবর্তন হয়। এই বিয়ে বড়দিদি স্বর্ণলতা দেখাই দিয়েছিলেন। তার পরে সেই ঠাকুর বাড়িতে কত বিধবা বিবাহ হচ্ছে।' (ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, পৃঃ- ২৭০)

প্রসঙ্গতঃ স্বর্ণলতা দেবী ১৮৮৩ সালে বিধবা ছিলেন না। বিধবা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং গুণাভিরামের অসামান্যা সুন্দরী কন্যা ছিলেন স্বর্ণলতা। মায়ের পূর্ব-বৈধব্যের দায়ভার বহন করতে হয়েছিল কন্যাকে ! নতুবা জোড়াসাঁকো-আসামের আত্মিক বন্ধনের সূত্রপাত ঘটত কবিগুরুর বিয়ের মধ্য দিয়েই।

কবিগুরুর দু'একটি কথার মধ্যেও সে সত্যটি নিহিত রয়েছে। যেমন একবার অগ্রজেন্দ্রনাথ ছবি তোলার প্রস্তাব করতেই কবি ইরাকে (জ্ঞানদাভিরাম -লতিকার কন্যা) সকৌতুকে বলছিলেন, 'তোর পিসিকে (স্বর্ণলতা) তো পাইনি, তবু তুই কাছে থাকলে ছবি তোলায় আপত্তি নেই।' (নীল-সোনালি র বাণী : রবীন্দ্রনাথ-আসাম সম্পর্ক, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য)। সেই ইরার জ্যেষ্ঠা কন্যা হলেন শর্মিলা ঠাকুর।

## ।২।

আমরা জানি যে, দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে ঠাকুর পরিবারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং আসামের সারস্বত পরিমণ্ডলে। কিন্তু তারও আগে আসামকে বিশ্বমানচিত্রের এক সুনির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর(১৭৯৪-১৮৪৬)। বাংলার তথা ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্পোদ্যোগিক বিকাশের স্রষ্টা দ্বারকানাথেরে বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন উত্তর-পূর্বের বিকাশ সাধনেও সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

আসামের মাটিতে প্রকৃতিজাত (Indigenous) চা ছিল মেজর রবার্ট ব্রুসের ১৮২৩ সালের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। স্বভাবতই ব্রিটিশরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনায় মনোনিবেশ করেন। লেফঃ চার্লটন, ক্যাপ্টেন জেনকিনস্, মিঃ গর্ডন, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষ এদের আকৃষ্ট করে পূর্বোত্তরর Indigenous Tea Plants; গড়ে ওঠে পরীক্ষামূলক চা-শিল্প ক্ষেত্র। তার অভূতপূর্ব সাফল্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিশ্ব শিল্প বাণিজ্যের মানচিত্রে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

ইতিমধ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে সাফল্য লাভ করেছিলেন দ্বারকানাথ। ব্রিটিশের সমান্তরালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর আখ চাষ (Sugar cane plantation), নীল চাষ (Indigo plantation), পাট চাষ (Jute plantation) এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যবাহী আধিকারিক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন ইউরোপীয় ম্যানেজার। বলাবাহুল্য যে, সাফল্যের শীর্ষস্তরেই ছিল তাঁর অবস্থান, সুতরাং তাঁর মত বাস্তববাদী এবং অর্থকরী চিন্তাবিদকে পূর্বোত্তরের দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ভিত্তিক শিল্পক্ষেত্র আকর্ষণ করবে— সেটাই স্বাভাবিক। 'Bengal Tea Association' তথা Carr-Tagore and company'র কর্ণধার দ্বারকানাথও ঐ সময় Upper Assam-এ চা বাগান শুরু করেন অভিজ্ঞ চিন দেশীয় চা-শিল্প কর্মীদের এনে। তাঁদের পরীক্ষামূলক সাফল্য East India Company কে প্রেরণা যোগায়। চা-কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে Blair Kling লিখছেন "At the end of 1838 the Tea committee reported to the Govt that operation in Assam were no longer mere experiments and recomended that they should be turned over at the earliest possiable date to 'the enterprise and energies of individual capitalists" (Partner in Empire, page-143)। তারই ফলশ্রুতিতে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ সালে গড়ে ওঠে 'The Assam Company Ltd'। পৃথিবীর বৃহত্তম চা-কোম্পানিটির Founder Directorsরা হলেন— প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু মতিলাল শীল (১৭৯১-১৮৫৪), এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা হলেন Richard Twinings, James Warren এবং William Duncan। প্রসঙ্গত William Duncan Brothers' কোম্পানিটি আজও সজীব রয়েছে বাংলাদেশের চা-শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে। ডিব্রুগড় শহরের Warren Industrial Ltd সম্ভবত James Warren এর স্মৃতি বহন করে আসছে। 'The Assam Company Founder Secy এবং Chairman ছিলেন দ্বারকানাথ সুহৃদ William Prinsep। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বারকানাথের Carr-Tagore & Company এবং Bengal Tea Association আসাম কোম্পানির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পিছনে ছিলেন Prinsep।

The Assam Company'র ৭৮ জন শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ভারত এবং ইংল্যান্ডের সর্বমোট ২০০০ শেয়ার ছিল। তন্মধ্যে দ্বারকানাথের Carr-Tagore Company'রই ছিল ৫০০ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ শেয়ার। (Altogether the Carr-Tagore "clique" held about 500 or one-quarter of the shares.... 'Blair Kling, P-143)। দ্বারকানাথের ৫০০ shares এর মধ্যে ছিল তাঁর নিজের নামে ১০০, উইলিয়াম কার ১০০, উইলিয়াম প্রিন্সেপ ১০০, টি, জে, টেইলার ১০০, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ৩০, রমানাথ ঠাকুর ২০, জন কার ২৫ এবং ডি, এম, গর্ডন-২৫। উইলিয়াম প্রিন্সেপ লন্ডন ফিরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর অংশ থেকেও ৩০টি শেয়ার দ্বারকানাথের Carr-Tagore Company'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন ১৮৪৪ সালে।

নবগঠিত চা কোম্পানিটির প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্বারকানাথের Carr-Tagore Company'র মিলনায়তনে, যেখানে দ্বারকানাথ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন। Blair kling লিখছেন 'At the 1st general meeting held on Aug'1841, the share holders were cheerful and confident. Dwarkanath Tagore moved that the proprietors express their 'most cordial concurrence' with the activities of the Directors as well as their confidence 'that the prosperity of the Assam Company will always be identified with the leading national interests'.

(Partner in Empire, P-151)

পরিচালক দ্বারকানাথদের 'The Assam Company টি প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৪৫ সালে অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত 'Royal Charter' শিরোপায় ভূষিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের ৬ জুন ভারতের গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন তদানীন্তন Board of Directorsরা। JNO Jenkins, W. Burkinyoung, Samuel Smith, Wm. Roberts, Wm. J. Judge এদের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবেদনে তাঁরা Assam Company'র সূচনা পর্বের Board of Directors দের সম্পর্কে লিখছেন— 'Supported by a highly respectable and wealthy body of proprietors in England and India...'।

প্রসঙ্গত, প্রসন্নকুমার ঠাকুরও জড়িত ছিলেন 'The Assam Company' এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চা-শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে। তাঁর জল-পরিবহন ব্যবস্থাপনায় চা-বাগানের প্রয়োজনে মালপত্র এবং চা-শ্রমিক আনা-নেওয়া চলত ব্রহ্মপুত্র ও সুরমানদীতে। দ্বারকানাথদের 'Dock-yard facilities ও ব্যবহৃত হত আসামের চা-শিল্পের প্রয়োজনে এবং তাঁদের Carr-Tagore কোম্পানি পাঁচ বছর মেয়াদে ৩৫০০০ টাকার কয়লা সরবরাহ করত পূর্বোত্তরের চা ফ্যাক্টরিগুলিতে।

আসাম প্রদেশকে বিশ্ব চা-মানচিত্রের শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছিয়ে দেওয়ার অগ্রদূত তথা 'কার টেগোর' কোম্পানির পার্টনার (১৮৩৪), ১৮৩৭ এর 'স্টিম নেভিগেশন' কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট,

কয়লা-রেশম-আফিম-সুরা বাণিজ্যের কাণ্ডারী, সুয়েজখাল খননের উদ্যোক্তা, নামকরা 'পেনিনসুলার এন্ড ওরিয়েন্টাল' জাহাজ পরিবহন সংস্থার পার্টনার এবং 'ওয়াটার উইচ' এর যৌথ মালিক দ্বারকানাথকে নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ভাবনার অবকাশ রয়েছে তাঁর সৃষ্ট চা-শিল্পক্ষেত্রের সূচনার সময়কাল, সংখ্যা, অবস্থানের ঠিকানা, চা-উৎপাদনের পরিসংখ্যান এবং সর্বোপরি 'The Assam Company'তে তাঁর অবদানের বিষয় নিয়েও। ১৮৪৫ এর ৪ মার্চ থেকে ১৮৪৬ সালের ৩১ জুলাই (তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত) ইউরোপ ভ্রমণে ছিলেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার 'মাই প্রিন্স' দ্বারকানাথ এবং ঐ সময়কালেই (১৮৪৫ সালে) লন্ডনে তাঁদের কোম্পানি 'The Royal Charter' শিরোপায় ভূষিত হয়েছিল। সেখানে দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত উপস্থিতি এবং অবস্থানের বিষয় নিয়েও আলোকপাত করার অবকাশ রয়েছে।

### । ৩ ।

আমরা দেখেছি 'The Forgotten Pioneer' প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আসামের চা শিল্পোদ্যোগ বিকাশের অগ্রদূত হিসাবে। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র)। কাছাড়ের মাটিতে তাঁর সগৌরব উপস্থিতি ছিল বিগত শতাব্দীর বিশ-ত্রিশের দশকের বেশ ক'বছর। Mr. Sanderman এর অধীন 'The Equitable Tea Company'র অন্তর্গত ছিল ঘুঙুর, শিলকুড়ি, রোজকান্দি প্রভৃতি চা বাগান। ১৮৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা ঐসব বাগানগুলির মধ্যে শিলকুড়ি বাগানটি ছিল বিখ্যাত এবং আজও সে খ্যাতি রয়েছে। ১৯৫৫ সালে ঐ চা বাগানের পাশেই বলতে গেলে এটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা হয়েছে তকলাই রিসার্চ সেন্টার 'Tea Research Association, Cachar Advisory Centre'। ১৯২০/৩০ এর দশকে অরুণেন্দ্রনাথ এই শিলকুড়ি চা বাগানের Superintendent এর মত এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উপরোক্ত Research Association এ Technical Officer হিসাবে কর্মরত অঞ্জন পুরকায়স্থ এবং তাঁর সহধর্মিণী অরুণা পুরকায়স্থ (ভট্টাচার্য) (Sr. Scientific Asstt.) উভয়েই শিলকুড়ি চা বাগানের অফিসে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন বিগত দিনের অর্থাৎ ১৯২০-৩০ এর ব্যাপারে কোনও কিছু জানার জন্য; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা কোনও নথিপত্রই পাননি সে সময়কার। কোম্পানি/মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডপত্রেরও হাতবদল ঘটে। ITA'র Surma Valley Branch, শিলচর শাখায় বিগত দিনের কিছু তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকতে পারে। জোড়াসাঁকো পরিবারের স্মৃতিধন্য শিলকুড়ি চা-বাগান এবং অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান নিয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা চিন্তা ভাবনা করতে পারেন।

### । ৪ ।

১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট এবং বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি মিঃ ডান্ডাস এর অনুমোদনক্রমে ভারতে জমি জমার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। এই ব্যবস্থা একদিকে যেমন মালিকানা সুনিশ্চিত করেছিল অপরদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদারির ধার্য খাজনা মিটিয়ে দেওয়ারও শর্ত আরোপ করেছিল, অন্যথায় জমিদারি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ধারাটিও আরোপিত হয়েছিল সেই প্রতিবিধানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে জমিজমা সংক্রান্ত এই নতুন আইন কানুন অনেকে বুঝে উঠতে না পারার জন্য হাতছাড়া হয়েছিল তাঁদের জমিদারি। তরুণ দ্বারকানাথ ঠাকুর নব প্রবর্তিত আইন কানুন বিষয়ে ছিলেন পারদর্শী, ফলে জমিদারি ও জমিজমা সংক্রান্ত আইন কানুনরের ফাঁকফোকর বুঝতে পেরেছিলেন ভালভাবেই। সেই সুবাদে অল্প বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার বিভিন্ন জমিদারদের আইনি উপদেষ্টা এবং এ কাজে রোজগার করেছিলেন প্রচুর অর্থ। অপরদিকে তাঁর নিজস্ব জমিদারিও সম্প্রসারিত হয়েছিল

হুগলি, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর এবং জেলা ত্রিপুরাতেও।

এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা এবং এ সম্পর্কিত আরোপিত আইন কানুনের বেড়াজাল ইত্যাদি বুঝে উঠতে না পারার দরুন ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেই সিলেট জেলার হুকমত রায় তালুক নীলামে উঠেছিল। ঐ সময় জেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের ২১১ নং তালুক হাতছাড়া হয়েছিল রায়ের উত্তরসূরিদের। দেওয়ান মানিক চাঁদ এস্টেট সমান্তরালে এগারসতী পরগণার শনবিল এবং সন্নিহিত অঞ্চলের ডলু-চান্দখানি-রামকৃষ্ণনগর ইত্যাদি এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল ঠাকুর পরিবারের জমিদারি। ঐ সব অঞ্চলের জমি বেচা কেনার দলিলে আজও দেখা যায়—

> অস্য জোত স্বত্ব ভূমি বিক্রী কবাল মিদং, জিলা কাছাড়, থানা রাতাবাড়ি, সাব-রেজিস্ট্রারী অফিস রামকৃষ্ণনগরের এলাকাধীন পং-এগারসতীস্থিত মহল দশ্‌না ১৫৭৯৬/২১১ নং তালুক হুকমত রায় হইতে ১নং A হিস্যা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর K.C.S.I. সংক্রান্ত।

অর্থাৎ ভূমি কেনাবেচার রাজস্বের অংশ বিশেষের ভাগীদার ঠাকুর পরিবারের উত্তর পুরুষ।

বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার এগারসতী পরগণা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের একাধিক তালুকও থাকতে পারে ঠাকুর পরিবারের জমিদারির অন্তর্গত। এ বিষয় নিয়েও ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে ।

### । ৫ ।

জনশ্রুতির আবর্তে কোনও বস্তু সময়ান্তরে সত্যসত্য নিরূপণে কার্যকারক হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় তার ইতিবাচক দিকটি। আজও জনশ্রুতির আবর্তেই রয়ে গেলেন বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার বর্ষিষ্ণু গ্রাম ব্রাহ্মণশাসনের প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রচার বিমুখ সাহিত্যকর্মী রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সাহিত্য-সরস্বতী।

তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী প্রবীণ আইনজীবী দুর্গাদাস শর্মা, সুপ্তীপর দেবব্রত শর্মা, আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কানুপদ মোহন্ত, ব্রাহ্মণশাসন এলাকার প্রবীণতম ব্যক্তি (প্রায় শত বৎসর বয়সী) বীরেশ চন্দ্র দাস (তৎকালীন মাইনর পাশ), গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রমেশচন্দ্রের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানা গেল যে, স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত মশাই তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত 'সাহিত্য-সরস্বতী' উপাধি লাভ করেছিলেন। পণ্ডিত মশাইয়ের অভিজ্ঞান প্রাপ্তির সন-তারিখ তাঁদের জানা নেই, সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেননি তাঁর পূর্ব নিবাস সম্বন্ধেও; এমন কি তাঁর মৃত্যুর সময়কাল নিয়েও ছিল ভিন্ন মত। তাঁরা দেখতেন শ্রীভট্টাচার্য অধিকাংশ সময়ই তাঁর ঘরে বসে লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সেসময় রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত 'সাহিত্য-সরস্বতী' অভিজ্ঞান পত্রটি তাঁর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকত। সে পত্রটির উপরের মধ্যভাগে ছিল গোলাকার সিলমোহর, তার ডানে-বামে যথাক্রমে ইস্যু নং এবং তারিখ। ভারী কাগজটির মাঝখানে ছিল কবিগুরুর স্বহস্তে লিখিত প্রায় ৮-১০ পঙক্তির অভিজ্ঞান এবং সবশেষে নিচে ডানদিকে বাংলা সন-তারিখ সহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর।

তাঁর মৃত্যুর পর সে সবের খোঁজ খবর কেউ বড় রাখেনি। ক্রমান্বয়ে হাত বদল হয়ে পড়ে তাঁর রেখে যাওয়া সাহিত্য কর্মের নিদর্শনগুলি ও অভিজ্ঞানপত্রটি, এমনকি দিনলিপিটিও। কথাপ্রসঙ্গে এডভোকেট দুর্গাদাস শর্মা জানালেন যে, পণ্ডিত মশাইর চিন্তাভাবনা, পোশাক পরিচ্ছদে ছিল রবীন্দ্রপ্রভাব। কবিগুরুর মতোই ছিল একমুখ পাকা দাড়ি ও গোঁফ, পরতেন আলখাল্লা; সভা-সমিতি-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গেলে ঐ ধরনের পোশাকই থাকত তাঁর গায়ে।

সাহিত্য-সরস্বতীর প্রতি আকর্ষণ এ প্রতিবেদককে বার কয়েক ঘুরিয়েছে ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের আনাচে কানাচে। প্রতিবেশী ব্যাঙ্ক ম্যানেজার একসময় পণ্ডিত মশাইর ঘর থেকে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা ছোট এক

খসড়া খাতা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেটি তুলে দেন আমার হাতে। তেমন কোনও আশাপ্রদ উপাদান সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি যা তাকে সম্পূর্ণ আকর গ্রন্থ বা পুস্তিকা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারে, তবে খসড়া খাতাটি ছিল সভাপতির অভিভাষণের মহড়ার নিদর্শন। সাহিত্য কর্মের টুকিটাকি সংবাদ ছাড়াও এখানে রয়েছে স্বদেশি ও অসহযোগ পর্বের কিছু খণ্ডচিত্র। প্রতিবেশী দেবব্রত শর্মার সহযোগিতায় পণ্ডিত মশাইর বাড়িতে গিয়েছিলাম বার কয়েক। তাঁর পালিত প্রজন্মের উত্তর পুরুষরা রয়েছেন তাঁরই রেখে যাওয়া বাস্তুভিটায়, সেখানে অভিজিৎ পাল এবং তার মায়ের সহযোগিতায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর একসময় প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। অবশেষে বহু পুরনো, ধুলোয় ধূসরিত এবং কালচে রং এর এক চটের থলি (বস্তা) থেকে গুটি কয়েক পাঠ্য বই, কিছু ছেঁড়া কাগজের টুকরো, চিরকুট, কীটদষ্ট হয়ে পড়া জমাখরচের (মূলত 'নারী শিল্পাশ্রম' সম্পর্কিত) হিসাব খাতা এবং কিছু পুরনো ও জরাজীর্ণ পুস্তিকা পাওয়া যায়। ঘরের দাওয়ায় বসে ঐসব ঘাঁটাঘাঁটি করে একসময় পেয়ে যাই পণ্ডিত মশাইর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র। তাঁদের আদি নিবাসের হদিসও খুঁজে পাই পণ্ডিত মশাইর অনুজ ভ্রাতা রবীন্দ্র ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীর পাণ্ডুলিপির এক ছিন্ন পৃষ্ঠায়। আরেকটি ছোট্ট পুস্তিকা 'বেহুলা'র ছিন্ন পৃষ্ঠায় দেখা যায় বইটি দ্বিতীয়া স্ত্রী সুরবালা দেবীকে উপহার স্বরূপ তুলে দিচ্ছেন পণ্ডিত মশাই, যেখানে তাঁর স্বাক্ষর স্থলে রয়েছে 'শ্রী রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্য সরস্বতী, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২০ বাংলা।'

ঐসব ছিন্ন ও অস্পষ্ট উপাদানের উপর ভিত্তি করে পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্য সরস্বতীর এক আবছা অবয়বই মাত্র দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্র অনুধ্যানে তা প্রাসঙ্গিক।

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্ম ১৮৭০ এর দশকে শ্রীহট্ট জেলার বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে এবং মৃত্যু ১২ শ্রাবণ ১৩৬৩ বাংলায় (২৮ জুলাই, ১৯৫৬ ইংরেজি) ব্রাহ্মণশাসন গ্রামে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করে তিনি একে একে শ্রীহট্টের অনেকটা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি নিরলস সাহিত্যচর্চা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি রোষানলে পড়ে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে পড়ার পর তিনি সপরিবারে চলে আসেন তদানীন্তন কাছাড়ের সমৃদ্ধশালী গ্রাম বড়খলাতে। এখানেই স্থানীয় স্বদেশি-ভাবাপন্ন জনসাধারণের সহযোগিতায় ১৯২০ সালে গড়ে তুলেন 'বড়খলা জাতীয় বিদ্যালয়'। ১৯২১-২২ সালের মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে নেতৃত্ব দেন বড়খলা অঞ্চলে। ঐ সময় জাতীয় বিদ্যালয় প্রধান সাহিত্য সরস্বতী এবং তাঁর অনুজপ্রতীম সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্বদেশব্রতী যতীন্দ্রমোহন দেবলস্কর, ইরমান মিঞা বড়ভুইয়া প্রমুখ কারাবরণ করেন। ৩ জানুয়ারি, ১৯২২ সালে আদালতের রায় প্রদানের আগের দিন শিলচর জেলে বিচারাধীন এই তিন বন্দিকে নিয়ে সম্ভাব্য 'সওয়াল-জবাবের' মহড়া পর্বও সেরেছিলেন পার্শ্ববর্তী 'সেল'এর কারাবন্দি দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন। কাছাড়ের জেলাধিপতি তথা ন্যায়- দণ্ডাধীশের বিচারে তাঁদের প্রত্যেকের ৫০০ টাকা জরিমানা এবং তা অনাদায়ে তিন মাসের সহজ কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীতে কাছাড় জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রথমা পত্নী নীরদা দেবী শারীরিক প্রতিবন্ধী থাকায় দ্বিতীয়া পত্নী সুরবালা দেবী যতীন্দ্রমোহন দেবলস্করের আর্থিক সহযোগিতায় নারী সমাজে সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন প্রবর্তনের জন্য ১৯২২ সালে শিলচরে গড়ে তুলেন 'নারী শিল্পাশ্রম'। সুরবালা দেবী ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষা এবং শ্যামাচরণ দেবের সহধর্মিণী সৌদামিনী দেবী ছিলেন এটির তত্ত্বাবধায়ক। একসময় সরকারি রোষানলে পড়ে 'শিল্পাশ্রম'টিও। ১৯২৩ সালের ২ জানুয়ারি এই নারী প্রতিষ্ঠানটির উপর রাইফেলধারী গোর্খা সৈন্য সহযোগে হামলা চালান তদানীন্তন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। নারী শিল্পাশ্রমটিও তখন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দবাজার, সার্ভেন্ট, জনশক্তি পত্রিকায় এই পাশবিক অভিযানের কাহিনী বিস্তৃতভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী, তাঁর অনুজপ্রতীম যতীন্দ্রমোহন দেবলস্কর,

**রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্য সরস্বতী, তাঁর বামে রয়েছেন স্ত্রী সুরবালা দেবী**

... সাহিত্য সরস্বতীর পোশাক পরিচ্ছদ, চিন্তাভাবনায় ছিল রবীন্দ্রপ্রভাব

অসহযোগ সমকালীন বড়খলা-শিলচর ইত্যাদি বিষয় একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেদনের দাবি রাখে।

যাই হোক, প্রায় বছর তিনেক কাছাড় জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে সাহিত্য সরস্বতী সপরিবারে চলে আসেন করিমগঞ্জের ব্রাহ্মণশাসন গ্রামে। তাঁর সম্বন্ধী তথা ব্রিটিশ মালিকানাধীন বুব্রিঘাট চা-বাগানের ম্যানেজার কেদারনাথ পুরকায়স্থের সহযোগিতায় তিনি থেকে যান ব্রাহ্মণশাসনে।

গ্রাম বরাকের বিভিন্ন আন্দোলনের সংগঠক, সভা-সমিতির প্রধান রমেশচন্দ্র সে সময় থেকে লেখালেখির দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁর বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সাহিত্য নিয়ে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ তখন প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার সাময়িক পত্রে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কানুপদবাবুর সহযোগিতায় যোগাযোগ করা হয়েছিল সাহিত্য সরস্বতীর নিকটাত্মীয়দের সাথে। অভিজ্ঞানপত্রটির বর্তমান হদিশ তাঁরা কেউই দিতে পারেননি। পৌত্রী জয়শ্রী চৌধুরী (ভট্টাচার্য) দাদুর একটি ফটোগ্রাফ দিয়েছিলেন এই প্রতিবেদককে। সচরাচর যা হয়ে থাকে এখানেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর্টিস্ট-এর বেপরোয়া তুলির আঁচড় বয়সের সঙ্গে অবয়বকে করে তুলেছে বড্ড unsymmetrical। অপরদিকে রমেশচন্দ্রের বাস্তুভিটায় গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বহু পুরনো, জীর্ণ এবং আবছা এক ফটোগ্রাফ পেয়ে যাই, পণ্ডিত মশাইর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্ত্রী সুরবালা দেবী। দেখতে পাই এডভোকেট শ্রী শর্মার কথারই যথার্থতা বহন করছে অশীতিপর সাহিত্য সরস্বতীর গোটা অবয়ব। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, তাই তুলে নিই ফটোগ্রাফটি।

পূর্বে উল্লিখিত শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের সূত্র ধরে খোঁজখবর নিই নির্ভরযোগ্য পত্রিকা 'যুগশক্তি' দপ্তরে। সাহিত্য সরস্বতীর মৃত্যুদিনের উল্লেখ পেয়ে যাই সেখানে। বর্তমান পত্রিকা সম্পাদক সমরজিৎ চৌধুরী ক্লেশ স্বীকার করেও পুরনো রেকর্ড খুঁজে ১৯৫৬ সালের ফাইলটি আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন। পত্রিকার ১৭ আগস্ট ১৯৫৬ সালের এক প্রতিবেদনে দেখতে পাই 'পরাধীন ভারতের লাঞ্ছিত দেশকর্মী পণ্ডিত রমেশচন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী'র পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কাছাড় জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সতীন্দ্রমোহন দেব, কুমুদরঞ্জন লহ, যতীন্দ্রমোহন দেবলস্কর, পরেশচন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাপদ দাস, মতিলাল জায়গীরদার, রমণীমোহন রায়, ব্যোমকেশ দাস, ইব্রাহিম আলি, জনাব সৈয়দ আলি, শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, সদয় গোবিন্দ দাস এবং সুরেশচন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

'বেহুলা'র ছিন্ন পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম পণ্ডিতমশাইর স্বাক্ষর স্থলে লেখা রয়েছে– ' শ্রী রমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী', তারিখ ১৬ই ভাদ্র, ১৩২০ বাংলা অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ, যা গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকায় সুতা কাটার ৯ (নয়) বছর আগেকার এবং স্বদেশি সমকালীন পর্বের। রমেশচন্দ্রের শতচ্ছিন্ন খসড়া খাতায় দেখেছি বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি পর্বে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় কবিতা ছন্দে তিনি সংস্কৃত 'ঋক্বেদ সংহিতা' অনুবাদক্রমে প্রকাশ করেছিলেন। সময়টি ১৯১৩ সালের পূর্বেকার, যখন বৃহত্তর বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুমান করা যায় যে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা পূর্ব- প্রান্তিকের নিরলস সংগ্রামী রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপরোক্ত সারস্বত সাধনারই ফসল হতে পারে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত 'সাহিত্য-সরস্বতী' উপাধি।

নোবেলজয়ী বিশ্বকবি নিশ্চিতই এমন কাউকে 'সাহিত্য-সরস্বতী' উপাধি বিতরণ করতে যাবেন না যদি তিনি সেই স্তরের যোগ্যতম ব্যক্তি না হন। সুতরাং জনশ্রুতির বস্তুভিত্তি যদি সর্বাংশে সত্যি হয়ে থাকে, তবে সেটি অবশ্যই ব্রাহ্মণশাসন তথা সমগ্র বরাকের কাছে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

অধ্যাপক ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানতে পারি যে, বিশ্বভারতীতে উপাধি

প্রদানের বিষয়গুলি নথিভুক্ত হওয়ারই রীতি ছিল। সুতরাং রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কবিগুরু প্রদত্ত ‘সাহিত্য সরস্বতী’ উপাধি প্রাপ্তির সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়ার মসৃণ পথটি খোলা রইল।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১. নীল সোনালির বাণী : রবীন্দ্রনাথ - অসম সম্পর্ক, ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা - ৪, ২০০৭
২. ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল, চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, ২০০৭
৩. কর্নেল মহিম ঠাকুর : জীবনী ও রচনা সংকলন, সম্পাদক - সুরেন দেববর্মণ, গৌরী দেববর্মণ মল্লিক, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা-১, ২০০৫
৪. যতীন্দ্রমোহন এবং গ্রাম কাছাড়ের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি (১৯০১-১৯৯১), সঞ্জীব দেবলস্কর, জয়ন্তী প্রেস, শিলচর-১, ২০০২
৫. Partner in Empire : Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India, Blair B. King, University of California Press, 1976
৬. Dwarkanath Tagore : A Forgotten Pioneer, Krishna Kripalani, National Book Trust of India, New Delhi - 16, Reprint 2005
৭. Origin and Development of Tea, Ed. Binoy B. Sen, EBH Publishers (India) Guwahati - 1, 2008
৮. The First Tea Company of the World : (An Essay Complied in Origin & Development of Tea), Debajit Kr. Sarma, Assam Company Ltd
৯. Memorial of the Assam Tea Company to the Governor General of India, Jenkins and others, Calcutta 6th June 1853. (Memorandum, Complied in Origin and Development of Tea)

# শিলচর শহরে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা

### দেবাশিস দাস

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সাহেবা যদি পাখি মারতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়; কিন্তু বাঙালার ইতিহাস নেই।'—এ আক্ষেপের মূলে আছে বাঙালির সঠিক ইতিহাস জ্ঞানের অভাব। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা ভিত্তি করেই বাঙালির আধুনিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। বরাক উপত্যকার ইতিহাস তাই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এসব ছিল ব্রিটিশদের রচিত রাজনৈতিক সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উন্মেষ এবং বিবর্তনের কথা ছিল সাম্রাজ্যের অধিগ্রহণের কথনের তুলনায় সীমিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে অনেক অজ্ঞাত ও অনালোচিত তথ্য গবেষক ও ইতিহাস-সংস্কৃতিপ্রেমীদের প্রচেষ্টায় ক্রমশ প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার আজ উদ্ভাসিত। সেই সঙ্গে বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর শহরকে কেন্দ্র করে বিগত শতকের শেষপর্ব এবং বর্তমান শতকের প্রথমপর্ব থেকে যে নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল তা একটা সুস্পষ্ট মাত্রায় পৌঁছে গেছে। প্রাক-স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং স্বাধীনোত্তর থেকে সাম্প্রতিক সময়ের এই বিশাল সাংস্কৃতিক জীবনের সম্যক পরিচয় তুলে ধরা সহজ ব্যাপার নয়। সমগ্র বরাক উপত্যকাকে বাদ দিলে শুধুমাত্র শিলচর শহরকে কেন্দ্র করেই এ ধরনের অনুসন্ধানে অনিবার্য কারণেই সীমাবদ্ধতা থাকবে। যদিও আমরা মূলত শিলচর শহরকে আলোচনার ভিত্তিভূমি হিসেবেই ধরব, তবুও প্রসঙ্গান্তরে অপর শহরগুলোকেও এমনকি গ্রাম-গঞ্জকেও বিবরণ ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করব। কারণ, শিলচর কিংবা যে কোন শহরের সংস্কৃতি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকবিহীন নয়।

শিলচর শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনা করতে গেলে শিলচর শহররের জন্মবৃত্তান্ত এবং বিবর্তনের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে স্মরণ করা কর্তব্য। ১৮৩০ সালে কাছাড়ি রাজ্যের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ১৮৩২ সনের ১৪ই আগস্ট রাজার কোন উত্তরাধিকার না থাকায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কাছাড়ি রাজ্য অধিগ্রহণ করেন। ১৮৩৪ সনে সরকারি তৎপরতায় শিলচর স্থানটি আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ব্রিটিশ অধিগ্রহণের সময় বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল উত্তরে বড়াইল পাহাড়, পূর্বে মণিপুর, দক্ষিণে মিজোরাম এবং পশ্চিমে উন্মুক্ত সমতল অঞ্চল। পশ্চিমের এই সমতল অঞ্চল বঙ্গদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ইতিমধ্যে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক শাসন কার্যের সুবিধার জন্য কাছাড়কে ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্গত করেন। শিলচর প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে চাকুরিজীবীদের আগমন আরম্ভ হয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে শিলচর বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে শিলচর শহর মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতি বা লৌকিক সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল

ছিল। কথকতা, কবির লড়াই এবং পাঁচালি ছিল সাংস্কৃতিক জীবনের মাধ্যম। একথা আজ নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্টের সংলগ্ন অঞ্চল হওয়ার ফলে শ্রীহট্টের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবে শিলচর শহরের আধুনিক পর্ব শুরু হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যপর্বে কর্মসূত্রে রামকুমার নন্দী মজুমদারের আগমন এবং তাঁর সাহিত্য কৃতি শিলচর তথা কাছাড়ের সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক যুগের সূচনা করে। কাছাড়ের সংগীত ইতিহাস লিখতে গেলে রামকুমার নন্দীর নাম অনিবার্যভাবেই এসে যায়। তবে রামকুমার নন্দীর যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আজকের শিলচরের সংগীতের পরিবেশের তুলনায় সেকালের সংগীতচর্চার পরিবেশ প্রায় ন্যূনতম বলা চলে। কারণ মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সংগীতের স্থান খুব উন্নতস্তরে দেখা হত না। গান তখন ভক্তিগীতি, ভজন, টপ্পা, লোকগীতি এবং কীর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রসংগীত তখনও সেরকম পরিচিতি লাভ করেনি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমান রূপ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সে যুগে রবীন্দ্রসংগীত রবিঠাকুরের গান বা রবিবাবুর গান এসব নামেই পরিচিত ছিল। বরাক উপত্যকাতেও রবীন্দ্রসংগীত ওই একই অভিধায় ভূষিত হয়েছে রবীন্দ্র সংস্কৃতির চর্চার প্রাথমিক পর্বে।

একথা বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রসংগীত কবে কোথায় আরম্ভ হয়েছিল এ তথ্য প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। তাই কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য ও কিছু পুরনো দিনের প্রবীণ নাগরিকের মুখের কথার উপর নির্ভর করেই এ নিবন্ধের অবতারণা। তবে এ আলোচনা কোন অবস্থাতেই কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। কিন্তু পাঠকরা এটাকে যেন প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করেন।

## । ২ ।

উনিশ শতকের বাঙালিদের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনে যে নবজাগৃতির সৃষ্টি হয়, তার ফলে বাংলায় এক নতুন এলিট শ্রেণি গড়ে ওঠে। সামাজিক প্রগতির চেতনার ভাবনাকে এরা প্রাধান্য দিতেন। ভারতের এই প্রান্তিক শহরেও প্রগতি চেতনার জোয়ার এসে পৌঁছায়। ১৮৭২ সালে শিলচরে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এই প্রগতি চেতনার ফসল। শিলচরে এই ব্রাহ্মমন্দির ‘কাছাড় ব্রাহ্ম সমাজ’ নামে পরিচিত ছিল। সেদিনের শিলচরে যারা ব্রাহ্ম ছিলেন না তারাও এই ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন, কেশবচন্দ্র সেনের হিতবাদী আন্দোলন তাদের প্রভাবিত করেছিল। শিল্পপট্টির ব্রাহ্মমন্দিরে (বর্তমান মহিলা কলেজ) উপাসনার দিন বেদ উপনিষদ পাঠ করার সঙ্গে ব্রহ্মসংগীতও গাওয়া হত। অবশ্য ব্রহ্মসংগীতের অনেক গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ছিল। তাই রবীন্দ্রসংগীত চর্চার প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে ব্রাহ্মমন্দিরকেই উৎপত্তি স্থল ধরে নেওয়া যেতে পারে। শিলচরে তখন সরকারি চাকুরির বদলির ফলে অনেক বাঙালি কর্মচারি আসতেন যারা অনেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন। শোনা যায় যে একজন সিভিল সার্জন মেজর জে, এল, সেন শিলচরে বদলি হয়ে আসেন। তাঁর স্ত্রী বেলা সেন সুকণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন। ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার দিন তিনি মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন। তার সুললিত কণ্ঠের আকর্ষণে শিলচর শহরে তৎকালীন রুচিশীল শ্রোতারা ব্রাহ্মমন্দিরে সমাগত হতেন। মেজর জে এল সেনের কন্যাদ্বয় রত্না ও কৃষ্ণা ও ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব, ভাদ্রোৎসব, প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করা হত। এইসব উৎসবের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করা হত। শিলচর শহরের প্রাক্তন পৌরসভাপতি রুক্মিণী দাসের গৃহে মাঘোৎসবের একটি দিন উদযাপন করা হত। রুক্মিণী দাস ত্রিশ দশক থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রুক্মিণী দাসের পিতা রায়বাহাদুর হরিচরণ দাস কলকাতায় ছাত্র অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার কেশবচন্দ্র সেনের একান্ত সচিব ছিলেন। (Statesman 19-7-90)। পিতার এই ভাবনায় রুক্মিণী দাসও শরিক হন। মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে রুক্মিণী দাসের গৃহে শিলচর গভর্নমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস ও তাঁর

কন্যা সংঘমিত্রা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন। সে সময়ের শিলচর শহরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন পবিত্রকুমার দত্ত সুগায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রতি মাঘোৎসবে রুক্মিণী দাসের গৃহে তিনি ব্রহ্মসংগীত পরিবেশন করতেন। ‘পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে’ এই গানে তার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করতেন। রুক্মিণী দাসের কন্যা অঞ্জলি দাসের কাছে জানতে পারি যে ১৯৫৫ সালে শেষ মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন বিজয়া নন্দী (চৌধুরী), ধীরেন চন্দ্র, শংকর বিশ্বাস ও সুপ্রিয় দাস। এভাবেই ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিলচর শহরে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা নিশ্চিতভাবে গড়ে উঠেছিল। ১৯৪১ সালের কাছাড় ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে মুদ্রিত কার্যপ্রণালী নিম্নে দেওয়া হল —

ওঁ
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।
১১১ তম মাঘোৎসব
কাছাড় ব্রাহ্ম সমাজ।
কার্যপ্রণালী

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারি রবিবার— প্রাতে ৮ ঘটিকায় মহর্ষিদেবের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে মন্দিরে কীর্তন ও উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর কীর্তন, মন্দির হইতে আরম্ভ। সন্ধ্যা ৬ ১/২ ঘটিকায় মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারি, সোমবার-সন্ধ্যা ৬ ১/২ ঘটিকায় রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রুক্মিণী দাস মহাশয়ের গৃহে কীর্তন ও উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১ শে জানুয়ারি মঙ্গলবার— সন্ধ্যা ৬ ১/২ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে কীর্তন ও উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারি বুধবার- সন্ধ্যা ৬১/২ ঘটিকায় মন্দিরের কীর্তন ও প্রার্থনা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার- সন্ধ্যা ৬ ১/২ ঘটিকায় মন্দিরে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি টি। বিষয়— “In time with the infinite” (আমরা কি চাই)

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারি, শুক্রবার— সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব প্রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে ঊষাকীর্তন তৎপর ৮ ১/২ টায় উপাসনা। মধ্যাহ্ন ১২টায় ভিখারী বিদায়। অপরাহ্ণ ৩ টায় শাস্ত্র পাঠ ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা। সন্ধ্যায় ৬ টায় কীর্তন ও তৎপর উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারি শনিবার- প্রাতঃ ৮ ১/২ টায় মন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩ টায় মন্দিরে মহিলা উৎসব, উপাসনা ও প্রার্থনা, কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য।

১৩ই মাঘ, ২৬ শে জানুয়ারি রবিবার- প্রাতঃ ৮ ১/২ টায় মন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩ ১/২ টায় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে কুলদা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভা। সন্ধ্যা ৬ ১/২টায় মন্দিরে উৎসবের শান্তিবাচন।

কাছাড় ব্রাহ্মসমাজ উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য সর্বসাধারণকে সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন।

মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
শিলচর, ২রা মাঘ
১৫ জানুয়ারি, '৪১ ইং বুধবার
শ্রী বাজেন্দ্রচন্দ্র দাস
সম্পাদক

কাছাড় ব্রাহ্ম সমাজ

রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন ও এখানকার চন্দপরিবার—এই ত্রিধারার মেলবন্ধন ইতিহাসবিশ্রুত। চন্দ পরিবারের প্রাণপুরুষ কামিনীকুমার চন্দই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূচনা করেন। রবীন্দ্রভক্ত কামিনী চন্দের পুত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রানুরাগের স্পর্শে সংগীত চর্চাও প্রাধান্য পেয়েছিল। কামিনীকুমার চন্দের পুত্র অরুণকুমার চন্দ রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অর্গান বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন, অনেক রবীন্দ্রসংগীত তাঁর আয়ত্তে ছিল। তবে প্রায়ই তিনি 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' ও 'ভুবনেশ্বর হে' গানগুলি অর্গান বাজিয়ে গাইতেন। তখন তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত সুরের তরঙ্গ। তবে খুব সম্ভবত: তাঁর প্রিয় গান ছিল 'ওহে জীবনবল্লভ' ও 'যদি তোর ডাক শুনে'-। বাড়ির ছাদে উঠে 'ওহে জীবনবল্লভ' যখন দরজা গলায় উচ্চগ্রামে গাইতেন, তখন অনেক দূর থেকে তা শোনা যেত। কামিনীকুমার চন্দের অন্য পুত্ররা হয়ত বা গাইতেন কিন্তু তা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা ধারণা করতে পারি যে সেই সময় থেকেই কিছু কিছু পরিবারে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা শুরু হয়, আজ তা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই। তবে বিশের দশক থেকে হেমচন্দ্র দত্তের বাড়িতে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালিত হত। এ সম্পর্কে সে সময়ের নগেন্দ্র শ্যাম সম্পাদিত 'ভবিষ্যৎ' পত্রিকাতে সংবাদ পরিবেশিত হয়। নগেন্দ্র শ্যাম ও হেমচন্দ্র দত্তের মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁদের বাড়িতে 'রবীন্দ্র সংঘ' স্থাপিত হয়। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের 'ভবিষ্যৎ' এর শারদীয় সংখ্যায় নগেন্দ্র শ্যাম লিখেছেন—'বাংলা সাহিত্যের গতি ও পরিণতির সহিত যোগ রক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্তের বাসায় একটি সান্ধ্য বৈঠক বসে। স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিলে লেখাপড়ার প্রয়োজন বোধ এ দেশের কম লোকেরই থাকে। এই মানসিক অবসাদ ও আরামপ্রিয়তা হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানপিপাসাকে বাঁচাইয়া রাখা বা উজ্জীবিত করা এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। বৈঠকের অলিখিত ব্যবস্থায় ইহার নাম 'রবীন্দ্র সংঘ'। হেমচন্দ্র দত্তের কন্যা যুথিকা দত্ত শান্তিনিকেতনে শিলচরের প্রথম ছাত্রী। তিনি ভাল রবীন্দ্রসংগীতও গাইতেন।

সে যুগে উচ্চশিক্ষার জন্য শিলচরের অনেক ছাত্ররা কলকাতায় পড়তে যেতেন, সেই সময় কলকাতায় রবীন্দ্র চর্চার সুযোগে অনেকে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা নিতেন। ছুটির অবকাশে তাঁরা শিলচরে এলে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন ও রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দিতেন। এ প্রসঙ্গে নতুনপট্টির রবীন্দ্রকুমার চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে রবীন্দ্রসংগীতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

বিশ শতকে নর্মাল স্কুলে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। এর প্রাণপুরুষ ছিলেন তৎকালীন সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী অঘোরনাথ অধিকারী। তিনিও রবীন্দ্রসংগীতের সুগায়ক ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হতো। তাঁর পুত্র পান্নালাল অধিকারীও ছিলেন সুগায়ক।

শ্রীহট্টের রবীন্দ্রসংগীত গায়ক দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে শিলচরে এলে রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগীরা তাঁর কাছে মূল্যবান উপদেশ পেতেন। তাঁর কাছে অনেক তালিমও নিতেন। দেবেন্দ্রনাথ দত্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র ছিলেন। শিলচর শহরে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারের ক্ষেত্রে যাঁরা নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ দেব ও নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্যামাচরণ দেব তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এ কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শিলচরে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম রবীন্দ্র সংস্কৃতির পথিকৃৎ ছিলেন। নিজে গায়ক না হলেও রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'বাণী পরিষদ' নামে এক সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম। এই সংস্থার অনুষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল নর্মাল স্কুল,

আর ডি আই হল এবং গভর্নমেন্ট স্কুল। 'বাণী পরিষদ' প্রতিবছর নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করতো। রবীন্দ্রসংগীত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাধান্য পেতো। ১৯৪০ সালে নগেন্দ্র শ্যামের অনুপ্রেরণায় শিলচরের তরুণরা সাহিত্যও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। নাম দিয়েছিলেন 'তরুণ রসচক্র'। অমরেশ দত্ত 'তরুণ রসচক্র'র সভাপতি। এই সংস্থা নাটক ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করতেন। অমরেশ দত্ত নিজে ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। 'তরুণ রসচক্র'র বসন্ত উৎসব ও রবীন্দ্রজয়ন্তীর মুদ্রিত অনুষ্ঠান সূচি এখানে দেওয়া হল :-

সৌম্য

আমাদের বসন্ত উৎসব ও রবীন্দ্রজয়ন্তীকে সবান্ধব উপস্থিতি দিয়ে সুন্দর করে তোলবার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

শেষ—
নিবেদক
তরুণ রসচক্রের সভ্যবৃন্দ

২৮ এপ্রিল ৪০ ইং
—বসন্ত উৎসব—
১ মে ৪০ ইং
সভাপতি : শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম
কার্যসূচী—
১। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত
২। রসচক্রের সভাপতির অভিভাষণ
৩। সেতার
৪। গান
৫। আবৃত্তি
৬। এসরাজ
৭। সভাপতির অভিভাষণ
রবীন্দ্রজয়ন্তী
২ মে ৪০ ইং
সভাপতি : রায়সাহেব হেমচন্দ্র দত্ত
১। রবীন্দ্রসংগীত
২। আবৃত্তি—(রবীন্দ্রনাথের কবিতা)
৩। আলোচনা এবং বক্তৃতা— (রবীন্দ্র-সাহিত্য)
৪। প্রবন্ধ পাঠ
৫। রবীন্দ্রসংগীত
৬। সভাপতির ভাষণ
বিঃদ্রঃ পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন প্রয়োজন বোধে অসম্ভব নয়। মহিলাদের বন্দোবস্ত থাকবে।

ত্রিশের দশক শিলচরের রবীন্দ্রসংগীত চর্চার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দশক। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর উপলক্ষে শিলচরে প্রথম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা' গ্রন্থে এ উদযাপনের কথা উল্লেখ আছে— 'কলকাতা ছাড়াও বাংলা ও বাংলার বাইরে রবীন্দ্রজয়ন্তী আয়োজিত হয়। শিলচর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, পুরী, মজফরপুর, গুয়াহাটি প্রভৃতি স্থানের রবীন্দ্রানুগারীরা জন্মোৎসব পালন করেছিলেন এবং পাঠিয়েছিলেন কবির প্রশস্তিসূচক মানপত্র।' পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে শিলচরের নাম প্রথম লিপিবদ্ধ হওয়াতে এই ধারণা করতে পারি যে রবীন্দ্র সংস্কৃতির মানচিত্রে শিলচর তার আপন স্থান সে যুগেই করে নিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব শিলচরের সুসন্তান অনিলকুমার চন্দ। ১৯৩১ সালে শিলচর আর ডি আই হলে এই রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপিত হয়। নগেন্দ্র শ্যামের নির্দেশনায় 'বর্ষামঙ্গল' গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন 'সিলেট ক্রনিকল' পত্রিকার সম্পাদক শশীন্দ্র সিংহের কন্যাদ্বয় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ফুল্লরাণী ও কুন্দরাণী সিংহ নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। 'রিমঝিম ঘন বরষে' গানের সঙ্গে সিংহ ভগ্নীদ্বয়ের বর্ণাঢ্য নৃত্য সেদিনের দর্শকদের মোহিত করেছিল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে গানের তালিমও নিতেন। শিলচরে এলে নতুন শেখা রবীন্দ্রসংগীত তাঁরা অনেক উৎসাহী শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিতেন।

ত্রিশের দশক থেকেই রবীন্দ্রসংগীত শেখার আগ্রহ ধীরে ধীরে শুরু হয়। তবে মধ্যবিত্ত সমাজে মেয়েদের আগ্রহ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রীতি দত্ত, অভ্র রেণু দাস, মায়া মজুমদার, মিলন মজুমদার, অঞ্জলি সেন, ফুল্লরাণী চৌধুরী, বাণী নন্দী, বেলা নন্দী, টগরকণা ধরভৌমিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা অন্যান্য গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতও গাইতেন। মায়া মজুমদার, মিলন মজুমদার ও ফুল্লরাণী চৌধুরী ঢাকা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন। প্রীতি দত্ত কলকাতার রেডিওতে গান পরিবেশন করতেন। আজকের দিনে বিচার করলে সেদিনের শিলচরে এই শিল্পীদের রেডিও স্টেশনে শিল্পী হওয়া নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে।

১৯৪০ সনে যে কামাখ্যা পদ ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় শিলচরে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, শিলচর শহরে এতদিন সংগীত শিক্ষার কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন আমাদের অভাব অনেকাংশে মোচন করেছে বললে সত্যের অপলাপ হবে না। সংগীত বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতও শিক্ষা দেওয়া হতো। এ ব্যাপারে নগেন্দ্র শ্যামের বিশেষ অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা চালু হয়েছিল। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ও মাতঙ্গিনী ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা শুরু হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রতি বৎসর সংগীত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হতো। আজও সেই ধারাবাহিকতা বজায় আছে।

শিলচর তথা কাছাড়ের নারী প্রগতি আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের সহধর্মিণী মালতী শ্যাম। মালতী শ্যামের কথা লিখতে গেলে তাঁর পিতা দীননাথ দাসের কথা এসে যায়। রায়বাহাদুর দীননাথ দাস ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে প্রগতিশীল মনোভাবের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি নিজে ব্রহ্মসংগীতও গাইতেন। দীননাথ দাসের মুক্ত চিন্তাধারা তাঁর মেয়েদের মধ্যে প্রভাব পড়েছিল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মালতী শ্যাম। শিলচরে মেয়েদের সাংস্কৃতিক জগতের প্রবেশের নান্দীপাঠে মালতী শ্যামের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। মালতী শ্যাম রায়বাহাদুর দীননাথ দাসের বাড়ির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। মালতী শ্যাম নিজেও গান গাইতেন। মালতী শ্যামের অনুপ্রেরণায় তাঁর বাসভবনে অবসর দিনে উৎসাহী তরুণ তরুণীদের রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হত। দীননাথ দাসের মেয়ে অমিয়া দাস ও সুশীলা রায়ও রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। ১৯৩৭ সনে শিলচরে মালতী শ্যাম ও অমিত পুরকায়স্থের উদ্যোগে নারী কল্যাণ

সমিতি নামে মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে একটি সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৩৮ সনে শিলচরে নারী কল্যাণ সমিতি রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে মালতী শ্যামকে এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানের চিঠি পাঠিয়েছিলেন :

কল্যাণীয়েষু

আমার জন্মদিনে তোমরা যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছ জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ বাংলা।

নগেন্দ্র শ্যাম ও মালতী শ্যামের অনুপ্রেরণায় তাঁদের নিজ গৃহে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সূচনা করেছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরীরা আজ সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামায় শিলচরের সাংস্কৃতিক জগতকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর সাংস্কৃতিক চর্চা আবার শুরু হয়। গুরুচরণ কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নববর্ষ, শারদোৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী ও সর্বোপরি সামাজিক সপ্তাহে রবীন্দ্রসংগীত এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। নর্মাল স্কুলে নববর্ষ মহাসমারোহে হতো। স্নিগ্ধ ও সুন্দর পরিবেশে শ্রোতারা মনোরম অনুভূতির রেশ নিয়ে যেতেন। জিসি কলেজের অধ্যাপক অমল গুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী ও দেবব্রত দত্ত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রেরণায় ছিলেন।

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভূপেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, অজিত বক্সী, অতীন্দ্র মোহন ঘোষ, হিরণ্ময় সেন, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট সংস্কৃতিবান নাগরিকবৃন্দের অনুপ্রেরণাও এর পেছনে ছিল।

১৯৪৬ সালে শিলচর সুরমাভ্যালি ছাত্র সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বরাক সেতুর প্রবেশপথ স্থান ও পিএইচই ওয়াটার প্ল্যান্ট এর সংলগ্ন স্থানে এই সম্মিলন হয়। দেবব্রত দত্ত ছিলেন সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত কবি ও রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তী। সেই সম্মিলনে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয়। গায়িকা ছিলেন চল্লিশ দশকের শিলচরের প্রখ্যাত গায়িকা পরিমল দাস। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রসংগীত শুনে প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, শান্তিনিকেতন থেকে এত দূরে রবীন্দ্রসংগীত এইভাবে গাওয়া হয় তা আমার ধারণা ছিল না। শিলচরের রবীন্দ্রসংগীতের মান সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তীর কথা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সে যুগে আনন্দময়ী ভট্টাচার্য ও ধীরেন চন্দ্র রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

শিলচরের জনমানসে রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করতে বামপন্থী ভাবধারায় গঠিত 'গণনাট্য সংঘে'র (আই পি টি এ) শিলচর শাখার অবদান অস্বীকার করা যায় না। চল্লিশ দশকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও গণনাট্যের সদস্য দিলীপ পালচৌধুরীর পরিচালনায় শিলচর শহরে ২৫শে বৈশাখ ও নববর্ষে বৈতালিক সংগীত গেয়ে পদব্রজে সমস্ত শহর পরিক্রমা শুরু করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্য দীপক বিশ্বাসের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত সেদিনের শিলচরে রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করেছিল। তবে তখন রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীতই পরিবেশন করা হত। ১৯৪০ সালে শিলচরে আয়োজিত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মুদ্রিত অনুষ্ঠান সূচি —

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিটি।
তারিখ— ১০/৫/১৯৪০ ইংরেজি
সময়— সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা
স্থান—শিলচর নর্মাল স্কুল হল

—অনুষ্ঠান সূচি—

১। সভাপতি বরণ

২। কবি প্রশস্তি-গৌরা গুপ্তা, আরতি দাস (২) আজমনি দাস, অর্চনা রায়, কলি দত্ত, খিনু, সানু ও উষা পুরকায়স্থ।

৩। সঙ্গীত (হে মোর চিত্ত)— লিলি দাস, পরিমল দাস, উষা দাস, আরতি দাস, (১) সাগরিকা শ্যাম, মালবিকা শ্যাম—(ভারতলক্ষ্মী)।

৪। আবৃত্তি নৃত্য (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)— দীপালি শ্যাম ও সুদীপা শ্যাম।

৫। প্রবন্ধ পাঠ (রবীন্দ্র কাব্যে নারী)— নিহারিকা দাস।

৬। আবৃত্তি, বাংলা ও ইংরেজি— প্রণতি দাস

৭। পল্লী নৃত্য (চল ভাই)— বাসন্তী দাস, উষা দাস, সাগরিকা শ্যাম, আরতি দাস, গৌরী নাথ, পুলিনবালা ধর ভৌমিক।

৮। আবৃত্তি (বাঁশিওয়ালা)— সুদীপা শ্যাম।

৯। নৃত্য— রাধারাণী দেবী

১০। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ

১১। সম্পাদিকার বক্তব্য

১২। রবীন্দ্রসংগীত— পরিমল দাস

এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র—

রবীন্দ্র জয়ন্তী
A.I.W.E শাখা শিলচর নারী কল্যাণ সমিতির অনুষ্ঠান

সবিনয় নিবেদন।

আগামী ১০ই মে (২৭শে বৈশাখ) শুক্রবার ৭ ঘটিকায় স্থানীয় নর্মাল স্কুলের হলে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ বিটি মহাশয়ের পৌরহিত্যে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে যোগদান করিলে আমাদের সমিতি বিশেষ বাধিত হইবে। আপনার পরিবারের মেয়েদের উপস্থিতি আমরা বিশেষভাবে কামনা করিতেছি।

শিলচর
৬ই মে, ১৯৪০ ইং

নিবেদিকা
মালতী শ্যাম
সম্পাদিকা, A.I.W.E. শাখা
নারীকল্যাণ সমিতি

বিঃদ্রঃ- আসিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্ডখানা সঙ্গে আনিবেন।

### । ৩ ।

স্বাধীনোত্তর শিলচরে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা আর সীমিত পর্যায়ে ছিল না। একটি লক্ষণীয় ব্যাপার যে শিলচরে দুর্গাপূজার সময় অথবা পরে বিচিত্রানুষ্ঠানের রেওয়াজ শুরু হয়। পাড়ায় বারোয়ারি পূজার প্রচলন হওয়ার ফলে অনেক শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন অথবা রবীন্দ্র গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, পরিবেশিত হত। এছাড়া শীতের মরশুমে শিলচরে অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠানে কলকাতার আমন্ত্রিত শিল্পীরা অনেকে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন। এ ধরনের পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি শিলচরের শ্রোতাদের আকর্ষণ ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। পঞ্চাশের শতকে নগেন্দ্র শ্যামের উদ্যোগে রবিজাগৃতি নামে এক সংস্থার আসর হত ব্রাহ্মমন্দিরে। এ আসরে সাহিত্য আলোচনা ছাড়া রবীন্দ্রজয়ন্তীও অনুষ্ঠিত হত। একথা বলা বাহুল্য যে শিলচরের উকিলপট্টির আবাসিকরা রবীন্দ্রসংস্কৃতি বজায় রাখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হেমচন্দ্র দত্তের বাড়িতে প্রায়ই রবীন্দ্র গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, চণ্ডালিকা ইত্যাদি উপস্থাপিত হত। সংগীতে মহিলাদের মধ্যে ইলা দত্ত, পরিমল দাস, বেলা দত্ত, জয়শ্রী চন্দ্র এরা মুখ্য অংশ গ্রহণ করতেন। ইতিহাসবিদ অসীমকুমার দত্ত এই অনুষ্ঠানে ধারাভাষ্য পাঠ করতেন। রবীন্দ্রসংগীত সে সময়ের শিল্পীরা রেডিও, রেকর্ড ও স্বরলিপি মিলিয়ে শিখতেন। কারণ সে সময়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষক না থাকায় সে সময়ের শিল্পীরা নিজেদের গায়কীতেই গাইতেন। তাই রবীন্দ্রসংগীতকে সঠিক উচ্চারণে সমৃদ্ধ করতে অসীম দত্তের প্রেরণা ছিল সবচেয়ে বেশি। পঞ্চাশের শেষার্ধে নীলা দত্তের পরিচালনায় 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য সেদিনের শিলচরের সাড়া জাগিয়েছিল। প্রযোজনার সাফল্যে পরবর্তীকালে আর ডি আই হল, রামকৃষ্ণ মিশন, জি সি কলেজ, গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। সংগীতে ছিলেন শংকর বিশ্বাস ও সুজলা দাস। শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব ঘোষ কোন একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলেন এবং এত সার্থক প্রযোজনা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শিলচর সংগীত বিদ্যালয়ে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, বাল্মীকি প্রতিভা ইত্যাদি নৃত্যনাট্য একাধিকবার পরিবেশিত হয়েছিল। সে সময়ের শিলচরে তরুণ গায়িকারা যাঁরা অন্যান্য গানের সাথে রবীন্দ্রসংগীতও গাইতেন। মেয়েদের মধ্যে আলো মিত্র, সুজলা দাস, রঞ্জিতা সরকার এবং পুরুষদের মধ্যে অমিয় দাস, জুয়েল চৌধুরী ও সৌরীন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

**১৯৬১** সন রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ণয় করেছিল। ওই বছরেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। জন্মশতবর্ষে বাঙালি চিত্তমানসে রবীন্দ্রসংগীত স্থায়ী আসন পেতে নিল। এর মূলে ছিল এইচএমভি থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত শিল্পীদের গান, বিভিন্ন নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের রেকর্ড। রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তী সত্যিই বলেছিলেন—'প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে যেমন আমরা রবীন্দ্রচর্চায় একটা উপলক্ষ্যগত প্রেরণা পেলাম তেমনি নানা চিন্তারও বিকাশ ঘটলো। ... রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠল রবীন্দ্রগানের বিপুল সমাদরের সাফল্যে।' এর ফলে রবীন্দ্রসংগীতের পাঠক্রম প্রবর্তন। জন্মশতবর্ষের জোয়ার শিলচরে এসে পৌঁছল। বিপুল সম্ভারে শিলচরের নবতম জেলা গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তর্পণে। শিলচরে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ আকারে বেড়ে গেল। শিলচর সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আনন্দময়ী ভট্টাচার্য কলকাতার বেঙ্গল মিউজিক কলেজ থেকে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বিশেষ ডিপ্লোমা নিয়ে এলেন। বর্তমানে বঙ্গীয় সংগীত পরিষদের অনুমোদনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিলচরে রবীন্দ্রসংগীতের কোর্স চালু করেছে। ষাট দশকের শিলচরে রবীন্দ্র মহিলা শিল্পীদের মধ্যে গৌরী ভরদ্বাজ, উমা ভট্টাচার্য, ইভা দেব, আলপনা দত্ত রায়, অনুজ রায়, শিবানী ব্রহ্মচারী, সেবা চৌধুরী, পার্বতী ব্রহ্মচারী এবং পুরুষদের মধ্যে সন্দীপ চৌধুরী, অশোক সেনের নাম বিশেষভাবে বলা যায় যারা রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

স্বাধীনোত্তর শিলচরে শিবানী ব্রহ্মচারী, সেবা চৌধুরী এবং গোপা বিশ্বাস গৌহাটি বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুমোদিত শিল্পী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে শিলচরের শিবানী ব্রহ্মচারী প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী যিনি কলকাতার রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্রসংগীতে পরিবেশন করেছিলেন। ১৯৮৯ সনে Statesman পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের review তে শিবানী ব্রহ্মচারী প্রশংসিত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ সুভাষ চৌধুরী রবীন্দ্রসদনের এই অনুষ্ঠানে শিবানী ব্রহ্মচারীর 'পরিচ্ছন্ন' পরিবেশনের প্রশংসা করেছিলেন (দেশ ১৯৮৯, ৮ এপ্রিল) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিবানী ব্রহ্মচারী রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম বি-হাই গ্রেড শিল্পী। ষাট দশকের শেষার্ধে এবং সত্তর দশকের প্রথমার্ধে শিলচরে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠল। এর মধ্যে রূপম ও দিশারী সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। সত্তর দশকের রূপমে বহু সুগায়ক ও সুগায়িকারা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। চাকুরির এবং বদলির সুবাদে অনেক গুণী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রূপমের সদস্য হয়েছিলেন। এবং পরোক্ষভাবে শিলচরে রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছিলেন। এদের মধ্যে সুদীপ্তা বসু ও পরিতোষ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। দিশারী সংস্থা শিলচরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার অন্য একটি নাম। দিশারী মৈত্রী উৎসবে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

সত্তর দশকে শিলচর সংগীত বিদ্যালয়ে আনন্দময়ী ভট্টাচার্যের পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীত চর্চার উদ্দেশ্যে 'রবিচক্র' গঠিত হয়। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় এই সংস্থার আসর বসত। এতে সুশীলা রায়, শিবানী ব্রহ্মচারী, সেবা চৌধুরী, গোপা বিশ্বাস, সৌরীন ভট্টাচার্য এবং সন্দীপ চৌধুরী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন।

আশির দশকে শিবানী ব্রহ্মচারীর অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রসংগীত চর্চার উদ্দেশ্যে শিলচরের 'সুরসপ্তক' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সুরসপ্তক আকাশবাণী শিলচরের প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের সম্মেলন সংস্থা হিসেবে অনুমোদিত হয়। সুরসপ্তকের রবীন্দ্রসংগীতের সুনির্বাচন এবং সঠিক উপস্থাপনার জন্য সুখ্যাতি ছিল। জলদবরণ দেবলস্কর, রেখা সেন, সুপ্তি সেন, বিশ্বতোষ চৌধুরী, দেবব্রত ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, শিবানী ব্রহ্মচারী, দেবাশিস দাস, মমতা দেবলস্কর ও উত্তম দে এই সংস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। কেবল রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার উন্নতিকল্পে আশির দশকে রাবীন্দ্রিকী নামে এক শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়। রাবীন্দ্রিকী সংস্থাটি এদের বার্ষিক উৎসব ও রবীন্দ্র জয়ন্তীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ১৯৭২ সালে শিলচর আকাশবাণী স্থাপন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আকাশবাণী স্থাপনে শিলচরে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার ও চর্চার বিকাশ আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল, এতদিন পর্যন্ত শিলচরে উপযুক্ত রবীন্দ্রসংগীতের ট্রেইনার ছিলেন না। এবার আকাশবাণী স্থাপনে সে অভাবটাও ঘুচল। আকাশবাণীর কম্পোজার হয়ে আসলেন ভক্তিময় দাশগুপ্ত, যিনি একদা কলকাতা ও ঢাকা রেডিও স্টেশনের রবীন্দ্রসংগীতের ট্রেইনার ছিলেন। ভক্তিময় দাশগুপ্তের উপযুক্ত শিক্ষায় অনেক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী তৈরি হল। পরিশীলিত উচ্চারণ ও সুরে এরা প্রায় সর্বভারতীয় স্তরে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। এদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দাম, পাপিয়া গুহ, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার ও বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৮ সনে অনুষ্ঠিত শিলচরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরীর গান শুনে 'বাংলার যে কোন প্রথম সারির প্রতিশ্রুতিময়' রূপে মন্তব্য করেছিলেন। এছাড়া শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঞ্চালী ধর ও রবীন্দ্রভারতীর সুরঞ্জনা পুরকায়স্থ রবীন্দ্রসংগীত চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন। সাম্প্রতিককালে শিলচরে সম্ভাবনাময় শিল্পীদের মধ্যে পঙ্কজ নাথ, শান্তা চৌধুরী, মনিদীপা চন্দ, মমতা চক্রবর্তীর নাম

উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘যুগ বদলায়, , কাল বদলায়, তার সঙ্গে সবকিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি।’ যাঁরা এই প্রান্তিক শহরে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার সূচনা করেছিলেন তাঁরা আজ অনেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁরা যে প্রদীপ জ্বেলে গিয়েছিলেন, তার আলোক ছড়িয়ে পড়েছে এই বরাক উপত্যকা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিকভূমিতেও।

**তথ্যসূত্র :**

১. স্মরণিকা, শিলচর সংগীত বিদ্যালয়, ১৯৯১
২. স্মরণিকা, উকিলপট্রি আবাসিক সংস্থা, শারদ সংখ্যা ১৪০২
৩. স্মরণিকা, মৈত্রী উৎসব, দিশারী ১৯৯৬, শিলচর, ১৯৯৬
৪. সুধীর চক্রবর্তী, নির্জন এককের গান; রবীন্দ্রসংগীত, কলিকাতা
৫. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নানা রবীন্দ্রনাথের মালা, কলিকাতা

# ঢাকাদক্ষিণে সপ্ততিতম রবীন্দ্রজয়ন্তী, ১৯৩১

## বাণীপ্রসন্ন মিশ্র

রবীন্দ্র মানস মানচিত্রে আমাদের বাংলাভাষার এ ভুবনের অনুপ্রবেশ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কধন্য সিলেটেও রবীন্দ্র চিন্তা চেতনা-স্রোতে ভেসে গিয়েছিল যার প্রভাব ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়িতে আছড়ে পড়েছিল। মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রর উত্তরসূরী এবং এদের আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসী মিলে ১৯৩১ সালে কবির যে সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করেন — বাণীপ্রসন্ন মিশ্রর প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ‘উন্মোচিত ঢাকাদক্ষিণ : শ্রীহট্ট ঠাকুরবাড়ির খণ্ডচিত্র’ থেকে এই অংশটি এখানে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় হুবহু উদ্ধার করা হল — সম্পাদক

কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ৬০তম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৯২১-এর ৪ সেপ্টেম্বর কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর পর কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে এল. কে. এলমহার্স্ট এসে পৌঁছোন প্রস্তাবিত শান্তিনিকেতনের কর্মভার গ্রহণের জন্য। শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয় ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২, আর শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ব্রতী বালক সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রতী বালক সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামের ছেলেদের মনে সমাজ সেবার আদর্শ সংস্কার করে তাদের দেহমন ঠিকভাবে গড়ে তোলা। ১৯২২ সালে (১৩২৮-২৯ বাংলা) বীরভূমের মহিদাপুর গ্রামে প্রথম সংগঠিত হয়েছিল ব্রতী বালক। বেশ কয়েক বছর পর ১৯৩৬ সালে সতীশচন্দ্র রায় ও ধীরানন্দ রায়ের সম্পাদনায় ‘ব্রতী বালক’ নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, কিন্তু দু বছর চলার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লেখাও এতে প্রকাশিত হয়েছিল (চিত্তরঞ্জন : ১২৫-২৬, ১২৮, ৬১৪; মুখোপাধ্যায়, প্রভাত)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অতি দ্রুত, ১৯২২ থেকে তিন বছর যেতে না যেতে, ১৯২৫ সালের (১৩৩২ বাংলা) মধ্যেই, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের ভাবাদর্শ ঈশান বাংলায় বহু দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে কিশোরমনে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়নে যারা এগিয়ে এলেন, তারা কেউ কখনও শান্তিনিকেতনে যান নি, ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেট এসেছিলেন, তখন এরা এতটাই ছোট ছিলেন যে সিলেট শহরে গিয়ে দূর থেকেও তাঁকে দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ির ব্রতীবালকগণ প্রতিমাসে দু-একবার পাঠশালা-গৃহে সভায় মিলিত হত, ওখানে ধর্ম, নীতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতার আয়োজন করা হত। প্রতিদিন অপরাহ্নে সমিতির সভ্যগণ নির্দিষ্ট স্থানে দেশী-খেলায় যোগ দিত, ব্যায়ামচর্চা ও লাঠিখেলা করত। ব্রতী বালক সমিতির কার্যালয় ছিল প্রবোধচন্দ্রের নিজ বাড়িতে।

এখানেই তাঁর জ্যাঠামশায়ের নামাঙ্কিত ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাগারে দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, উত্তরা, শিশুসাথী ও আরো কিছু সাময়িকী নিয়মিত সংগৃহীত হত। 'ব্রতী' পত্রিকার প্রতিবেদনে 'প্রবাসী'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাগারে অর্থমূল্যে 'প্রবাসী' দিতে স্বীকৃত হওয়ার জন্য, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'-র কর্তৃপক্ষকে অল্পমূল্যে পত্রিকা-দানের জন্য, এবং ঠাকুরবাড়ি গ্রামের নীরদ বিহারী মিশ্র মহাশয়কে মাসিক বসুমতী ও আনন্দবাজারের ষাণ্মাসিক মূল্য ৭ টাকা দিতে সম্মতিদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যেমন আশ্বিন মাসে পূজার ছুটিতে সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন উৎসবে, ঠাকুরবাড়ির বেশ বড় পাঠশালাগৃহে পুরোদস্তুর স্টেজ বানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নাটক ইত্যাদি পরিবেশিত হত। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৭-এ দুর্গাপূজার ছুটিতে ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ির ব্রতী বালকবৃন্দ বিখ্যাত নাটক 'বঙ্গে বর্গী'র প্রথম অঙ্ক, সুকুমার রায়চৌধুরীর 'ঝালাপালা' এবং রবীন্দ্রনাথের ষড়ঋতুর অভিনয় প্রদর্শন করেন। 'ব্রতী' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে ঐ সময়ে সমিতিতে নিবন্ধীকৃত ব্রতী বালকের সংখ্যা ছিল সাতাশ, এবং উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'সমেত ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক ও সাধারণ' সকলেই অভিনয় উপভোগ করেছিলেন।[১]

সমেত সকলের উদ্দেশ্যে ব্রতী বালক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলা হয়েছিল ঃ

> প্রত্যেক পল্লীতে একটা নবজাগরণের ভাব আসিয়াছে। প্রত্যেকের ভিতরে লোক সেবা ও মনুষ্যত্ব লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। কিসে আমরা মানুষ হইব, কিসে আমরা আর ৫ জনের নিকট গর্ব্বোন্নত শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিব, সেই চিন্তা আমাদের হৃদয়কে ভাবাবেশে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। জাতীয় কবি এই কথা স্মরণ করিয়াই গাহিয়াছেন ঃ
>
> রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি
> পূর্ব্বউদয়গিরি ভালে।
> গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ
> নব জীবনরস ঢালে।।
>
> পল্লীসেবার পথ — মনুষ্যত্ব লাভের পথ কুসুমাস্তৃত নহে, অনেক সময়ে উহা বিঘ্ন-কন্টক-কঙ্করিত হইতে পারে। প্রার্থনা করুন আমরা যেন লক্ষ্যে ও আদর্শে দৃষ্টি রাখিয়া, ভগবানের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এই অনুষ্ঠানে সাফল্য লাভ করি।

'ব্রতী' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমিতির কথা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে ১৩৩৫ বাংলার ১৬ কার্তিক তারিখে (অর্থাৎ, ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে) ব্রতী বালক সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে শ্রীহট্ট রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুলের হেডমাস্টার দিগেন্দ্র নাথ দাস এম.এ, বি.এল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন। কিন্তু তিনি আসতে না পারায় মৌলভীবাজারের উকিল ও স্কাউট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালায় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

> দুই চারিদিন পূর্ব্ব হইতেই সমিতির সভ্যগণ মণ্ডপটিকে নানাবিধ পুষ্প, পতাকা, লতা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কর্ম্ম কুশলতায় মণ্ডপটি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, বিখ্যাত কুস্তীগীর নাইডুর চার্ট, ও সুভাষ বসু প্রভৃতির চিত্র দ্বারা মণ্ডপটিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলা [তোলা] হইয়াছিল। মণ্ডপের ভিতর একদিকে 'স্টেইজ'

> ও তাহার নিকটে সভাপতির আসন, একটি ক্ষুদ্র প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১০০ খানা বেঞ্চে ৫০০ শত [পাঁচ শত] লোকের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। ১৬ কার্তিক দুই ঘটিকার সময় অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভায় প্রায় ২৫০ জন স্থানীয় ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। দপ্তরাইল, কানিশালী, দক্ষিণভাগ, ভাদেশ্বর, রায়গড়, গোলাপগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম হইতে দর্শকগণ সভায় যোগদান করেন।

সভায় সমিতির কার্যবিবরণী, সংগীত, বক্তৃতা, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গমাতা'। সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য থেকে বক্তৃতা দেন মোঃ আবদুল মুন্তাকিন চৌধুরী, ঢাকাদক্ষিণ সরকারি ডিসপেন্সারির ডাক্তার কামিনী কুমার চক্রবর্তী, দেবেশ কমল ভট্টাচার্য ও রমাপদ ভট্টাচার্য। 'ব্রতী' পত্রিকার পাতায় বক্তৃতার সারসংক্ষেপ দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল —

> মোঃ আবদুল মুন্তাকিন চৌধুরী সাহেব বলেন — তিনি আজ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত একথা ভাবিয়া তিনি দুঃখিত হইতেছেন। দেশের মধ্যে এতবড় একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে একথা তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানানো উচিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। দেশের প্রত্যেক বালক ও যুবককে তিনি উহার সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় বিদায় সংগীত দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়; এর পর ন'টা থেকে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালারই সভাগৃহে চলে মঞ্চাভিনয়। বিজয় মজুমদারের 'সংশোধন' ও রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' একের পর এক অভিনীত হয়। অভিনয় অনুষ্ঠানে দর্শকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় সাত শো।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে 'ব্রতী' পত্রিকার ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রমাপদ ভট্টাচার্যের তিনটি কবিতা ও একটি ক্রমশ প্রকাশিত বড়গল্প 'বিনিময়'-এর একটি অংশ। কবিতাগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল — 'প্রহেলিকা', 'লাঞ্ছিত' এবং 'গৃহহারা'। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে প্রজাসাধারণের দুর্দশা, স্ত্রীজাতির অসহায়তা ও আদর্শবাদী যুবকের এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার যে ইঙ্গিত গল্পটির খণ্ডিত অংশে পাওয়া যায়, তাতে সম্পূর্ণ গল্পটি না পাওয়াতে বেদনাবোধ হয়। ব্রতী বালক সমিতির সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে আবদ্ধ বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন রমাপদ ভট্টাচার্য স্বাধীনতা সংগ্রামের কঠিন ব্রতে জিতেন্দু কুমার নামের আড়ালে সাহিত্য জগৎ থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন। মাত্র চার পঙক্তির একটি কবিতা 'লাঞ্ছিত'। কিন্তু ওই কবিতাটিতে তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় অতি সহজেই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

রূপের মাঝে ঘৃণিত যারা করিছে হাহাকার,
বাক্যহীন লভিছে যারা তীব্র তিরস্কার,
শ্মশান ঘাটে কাঁপিছে বায়ু যাদের আগমনে,
তাদের তরে করহে স্থান তোমার চিত্তাসনে।

ওই একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে অশোক বিজয় রাহার তিনটি কবিতা ও একটি চিঠি। কবিতাগুলি হল — 'গৃহদ্বারে কুড়িয়ে পাওয়া গোলাপের প্রতি', 'রহস্য' ও 'বিদায় বাঁশী'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, "স্কুলের উপরের ক্লাসে পড়বার সময়ে তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত 'কমলা' পত্রিকায়" (পাল, অমল: ৩)। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। সুতরাং 'ব্রতী' ও 'কমলা'

পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের ঘটনা সমসাময়িক। সে যাই হোক, যারা অশোকবিজয়ের কবিকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন, এখনও পর্যন্ত সাহিত্যের প্রকাশ্য জগতে অজ্ঞাত কিন্তু হস্তলিখিত 'ব্রতী' পত্রিকায় তাঁর কবিজীবনের উন্মেষপর্বে রচিত এই কবিতাগুলি নিশ্চিতভাবে, সে সব গবেষকদের নতুন রসদ জোগাবে। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রপ্রভাব কতটুক সে সম্পর্কে কোন সূক্ষ্ম মন্তব্য করতে আমি অনধিকারী, কিন্তু অশোকবিজয়ের যে চিঠি ব্রতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের আভাস স্থূলদৃষ্টিতেও পরিমেয়। প্রবোধচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখা ঐ অভিমানী চিঠিটির খানিকটা অংশ পুনরোদ্ধৃত করা যাক। এতে ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়িতে নিজের জন্ম-মাটির সঙ্গে তাঁর প্রাণের সংযোগ কত নিবিড় ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় —

> প্রবোধ ঠাকুর! ভাই! আমার কাছে আর কি তোমার লিখতে ইচ্ছে হয় না? হবেই বা কি করে? যে ছেলে মায়ের বুকভরা স্তন্যটুকু উপেক্ষা করে', তার কাছ থেকে আপনি নির্বাসিত হয়ে ..... মায়ের কোলের ভাই তাকে ডাকবে কেন? কিন্তু ..... তুমি কি ভাবছো জানি না, আমার প্রাণ আজ কয়দিন থেকে' বাড়ির জন্যে আনচান করছে, ভোরের প্রাণমাখা আলো, দিনের পাখীর ডাক, ম্লান সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নার রাত, বাতাসের স্পর্শ, আকাশের বুকে শিশু মেঘের চাঞ্চল্য এসব দেখে যেন, আমার শুধুই মনে পড়ে, সেই বাড়ি, সেই শেফালী, সেই পুকুর, সেই ঘাট, সেই বকুল গাছ, আর গোপনে দুই ফোঁটা অশ্রু মুছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, রবীন্দ্রনাথ যখন ত্রিশোর্ধ যুবক, ঈশান বাংলার সঙ্গে তখন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূচনা হয়, এই অঞ্চলের অনেক গুণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কর্মসূত্রে পরিচয় ঘটে। এছাড়া, তিনি নিজে ১৮৯৯ থেকে শুরু করে ১৯২৫ পর্যন্ত সময়ে সাতবার ত্রিপুরা গেছেন, ১৯১৯, ১৯২৩ ও ১৯২৭-এ তিনবার গুয়াহাটি হয়ে শৈলশহর শিলঙ যান, আর সেই ১৯১৯-এ একবারই মাত্র পদার্পণ করেন সুরমা উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শ্রীহট্ট শহরে। কবির মূল ভ্রমণসূচিতে শ্রীহট্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু শিলঙ-গুয়াহাটিতে থাকাকালীন করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্ট থেকে তাঁকে বারবার পাঠানো সনিবন্ধ আমন্ত্রণ কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি রেলযোগে গুয়াহাটি থেকে লামডিং-বদরপুর-করিমগঞ্জ-কুলাউড়া হয়ে শ্রীহট্টে এসে পৌঁছান ৫ নভেম্বর ১৯১৯, আর প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীহট্ট থেকে আগরতলার দিকে ট্রেনে চাপেন ৮ নভেম্বর (উষারঞ্জন ঃ ৪৬-৫৯, ১০৩-১২১)।

করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে রেলকর্তৃপক্ষের অনুমতিতে তিন মিনিটের জায়গায় গাড়ি পঁচিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। করিমগঞ্জের জনসাধারণ-প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছিল ঃ

> বাঙলাদেশের এই প্রান্তভূমি আজ ভাষাজননীর সেবায় তেমন অগ্রসর না হইলেও চিরকাল এমন নীরব ছিল না। এই করিমগঞ্জ শহরের অনতিদূরে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি। প্রেমের বন্যায় যিনি বাঙ্গালার পাপরাশি ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন সেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পিতৃপিতামহের পদাঙ্কিত পুণ্যভূমি ঢাকাদক্ষিণ বহুদূর নহে। শ্রীহট্ট জেলার নানা ভূখণ্ড তাঁহারই পার্শ্বচর অদ্বৈতপ্রভু, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুপাদগণের পদরজানুরঞ্জিত বলিয়া গৌরবান্বিত। আজ তোমার শুভাগমনে শ্রীহট্টের সে গৌরব সেই প্রাণ ফিরিয়া আসুক (তদেব)।

তবে, যদিও তিনি নিজে মাত্র একবার এখানটায় এসেছিলেন, তবু সুরমা-বরাকে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিমেয়। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য ও অন্য অনেকের গবেষণা-কর্মে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখানে হস্তলিখিত 'ব্রতী' পত্রিকার সৌজন্যে আরো কিছু অকথিত কথা পরিবেশনের দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেছে।

ঠাকুরবাড়ি ব্রতী বালক সমিতির উদ্যোগে ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়িতে সপ্ততিতম রবীন্দ্র-জয়ন্তী-দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হয়েছিল। অশোকবিজয় রাহাকে প্রবোধচন্দ্রের লেখা একটি চিঠির প্রত্যুত্তর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে উৎসবের প্রস্তুতি ১৯৩১ এর গোড়ার দিকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অশোকবিজয় লিখেছেন ঃ

> তোমার চিঠিখানা আজ এসে আমার হাতে পৌঁছেছে। শুনে ভারি আনন্দ হচ্ছে, যে আমাদের গ্রামেও এবারকার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সাড়া পড়ে গেছে। এই তো চাই! দেশের শ্রেষ্ঠ কবির যে এবার সত্তর বর্ষ পূর্ণ হল, এ খবরটি বাংলার গ্রামে গ্রামে না পেলে চলবে কেন? আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের এ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি এবং আশা করছি অদূর ভবিষ্যতের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সুস্থ শরীরে তোমাদের সাথে মিলব। ... তুমি বলেছ, আমি তোমাদের suggestion দেব, কিন্তু ঐ রকমের কোনো কিছুই কস্মিন্ কালে আমি দিয়েছি যে এবার দিতে পারব? আমি নেহাৎ একটা খেয়ালী ধরনের লোক, নিজের খেয়ালে হঠাৎ কখনো কখনো দু'টো-একটা গানের সুর ধরে পথ চলি; তা-ও আবার ঢের সময়েই বে-সুরো হয়ে ওঠে। এ হেন খাপছাড়া লোকের কাছ থেকে কি কেউ কখনো কোনো practicable scheme অথবা suggestion আশা করতে পারে? ... আমার সত্য পরিচয়টাই হচ্ছে —
>
> কথায় কথায় রচে কথার
> হেঁয়ালি, —
> আমার মাঝে আছে সে এক
> খেয়ালী!
> সারাটি দিন বেড়ায় ঘুরে' তানপুরাটি বুকে ক'রে
> হঠাৎ কখন ব'সে পড়ে
> ধুলাতে, —
> পথিক যতো দেশ বিদেশে ভিড় করে সব দাঁড়ায় এসে,
> নানান জনের মন জানে সে
> ভুলাতে!

কাজেই, আমি যে কার্যকরী কোনো নির্দেশই দিতে পারিনে, এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। অবশ্য তার মানে এ নয়, যে আমি তোমাদের এ প্রচেষ্টাকে কেবল দূরের থেকেই encourage করব, তোমাদের মাঝখানে গিয়ে তোমাদের একসাথে একটা কাজও করব না। ..... তোমার scheme, suggestion, যাই কেন না কর, এ কথাটা ভুললে চলবে কেন, যে যাঁর জয়ন্তী উৎসব করতে যাচ্ছ, তিনি হচ্ছেন সব খেয়ালীর সেরা রাজখেয়ালী! কাজেই তাঁকে উদ্দেশ করে কোনো উৎসব করতে গেলেই সে উৎসবের উপকরণ - হিসাবেও অন্ততঃ একজন খেয়ালী লোককেও থাকতে হয়। আমি তোমাদের উৎসবে ঐ খেয়ালীর কাজটুকুই নেব .....

হাঁ, তা হলে এই ঠিক রইলো যে যদি কোনো এক শুভক্ষণে কবিগুরুকে আমার হৃদয়ের আলোকে অভিনব রূপে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই সেই মুহূর্তের লেখাটি নিয়ে শীঘ্রই তোমাদের মাঝখানে গিয়ে মিলব। এ কয়দিন আমি বাড়ী-হারা হয়ে রাতের পর রাত জাগছি। আমি আজকাল যথার্থই উপলব্ধি করছি যে ম্যাথু আর্নল্ড্ সত্যই বলেছেন, — 'It requires a heaven-sent moment', পরীক্ষার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি মাত্র তিনটি কবিতা লিখেছি; তার মধ্যে একটি মাত্র কবিগুরুর উদ্দেশে

লেখা। তার আরম্ভটা হচ্ছে ঃ

> "অস্তরবির বিদায়-গোধূলি নামিবে কখন দিনের শেষে,
> দীর্ঘ পথের যাত্রীর মুখে চাহি আজি মোরা নির্নিমেষে"।

কবিতাটির প্রত্যেক কলিতে আটটি করে ছত্র, এবং পাঁচটি কলিতে কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়েচে।

প্রস্তুতি-পর্বে ২৪শে জ্যৈষ্ঠের কথা ভাবা হলেও পরিশেষে ১৩৩৮ বাংলার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ঠাকুরবাড়ি ব্রতী বালক সমিতি কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবার, যেহেতু সমগ্র ঢাকাদক্ষিণের জন্যই এই উৎসব সুতরাং উপলক্ষ বিবেচনা করে দপ্তরাইল মধ্য ইংরাজি স্কুলে উৎসবের স্থান নির্ধারিত হয়। 'ব্রতী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত 'উৎসবের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে জন্মজয়ন্তী ঠিক কীভাবে পালিত হয়েছিল, তা দেখা যাক ঃ

> ব্রতী বালকগণ পত্র ও পুষ্প দ্বারা গৃহটিকে কবির কাব্য-কাননে পরিণত করিয়াছিলেন। উৎসব গৃহের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড তোরণ নির্ম্মিত হয়। কবির আসনের জন্য একটি মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমিতির পৃষ্ঠপোষক শ্রী বিধুভূষণ মিশ্রের শিল্পনৈপুণ্যে মঞ্চটি এতই সুন্দর হইয়াছিল যে উহা দর্শকদের নয়ন ও মনকে হরণ করিয়া নিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।
>
> উৎসব নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত হয়। সকাল ৬ ঘটিকায় প্রভাত-বন্দনা, ৮ ঘটিকায় কবির অভিষেক ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সভা। ঐ দিবস সকাল ৬টায় ব্রতী বালকগণ রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো' এই গান গাহিতে গাহিতে প্রতি গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। ব্রতী বালকগণ ছাড়া প্রায় ২০০ শত [দুই শো] লোক প্রভাত বন্দনায় যোগদান করিয়াছিল। ৮ ঘটিকায় শোভাযাত্রা ফিরিয়া আসিলে পর কবির অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রতী বালকগণ মঙ্গল-ঘট সকল জল-পূর্ণ করতঃ তাহাতে আম্রপত্র দিয়া ঐ সকল তোরণের দুইপাশে ও মঞ্চের দুইধারে সারিসারি স্থাপন করেন। তারপর ব্রতী বালিকাগণের উলুধ্বনি [ধ্বনি] ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে কবির একখানা প্রতিকৃতিকে মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয়। ব্রতী বালকগণের প্রত্যেকে কবিকে মাল্যদান করেন। অতঃপর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণও কবিকে মাল্যদান করেন। ব্রতী বালিকাগণ ধান্য-দুর্ব্বা দ্বারা কবিকে অর্ঘ্য দান করেন। অতঃপর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
>
> অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার বহু পূর্ব্বেই উৎসব গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যথাসময়ে শ্রীযুক্ত বীরেশ চন্দ্র মিশ্রের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ নন্দী বি.এল মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।
>
> অতঃপর ব্রতী বালিকা শ্রীমতী তুলসীবালা মিশ্র 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে' গানটি গান করিলে পর 'কবি বন্দনা' অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতী বালকগণ নিম্নলিখিতভাবে সত্যেন্দ্র দত্তের 'কবির জুবিলি'র ৮টি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কবিকে বন্দনা করেন।

| | |
|---|---|
| (ক) বিশ্বযোগী | - শ্রী গৌরাঙ্গ দাস মিশ্র |
| (খ) স্বর্গদূত | - শ্রী নন্দলাল মিশ্র |
| (গ) প্রকৃতি | - শ্রী জানকী মোহন মিশ্র |
| (ঘ) বালক | - শ্রী সুরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য |
| (ঙ) ভৃত্য | - শ্রী অরবিন্দ কুমার দাস |

(চ) কাবুলিওয়ালা - শ্রী জাহ্নবী মোহন মিশ্র
(ছ) খুড়া-মহাশয় - শ্রী অপূর্ব্ব কুমার দাস
(জ) অপরূপরূপা বাংলা - শ্রী পবিত্র কুমার মিশ্র
(ঝ) বন্দনা (সঙ্গীত) - ব্রতী বালিকা শ্রীমতী তুলসী বালা মিশ্র

ব্রতী বালকগণ প্রত্যেকেই যথাক্রমে এই সমস্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কবিকে আশীর্ব্বাদ, মাল্য, পুষ্পপত্র, ভেঁপু, নমস্কার, আঙ্গুর, মাল্য প্রভৃতি দান করেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে সামান্য ক্ষণভঙ্গুর একটা পাতার 'ভেঁপু' দেওয়া প্রত্যেকের ভিতরই একটা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

কবি বন্দনার পর ব্রতীবালক সমিতির পক্ষ হইতে ব্রতী বালক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেশ চন্দ্র মিশ্র 'কবি-প্রণাম' পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রমাপদ ভট্টাচার্য্য, প্রবোধচন্দ্র মিশ্র ও সত্যেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করেন। জীবনী আলোচনার পর শ্রীযুক্ত অশোক বিজয় রাহা 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতাটি তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। উহা ছাড়া তিনি আরও একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত রমাপদ ভট্টাচার্য্য কবির উদ্দেশে লিখা তাহার কবিতাটি পাঠ করেন এবং 'সোনার তরী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। অতঃপর ব্রতী বালকগণ আবৃত্তি করেন। প্রত্যেক আবৃত্তির পর একটি করিয়া সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র তাঁহার সঙ্গীত দ্বারা উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাহার মৌখিক অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন— 'আজ আমার আনন্দ হচ্ছে যে গ্রামেও আমি এইরূপ অনুষ্ঠান দেখিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে শ্রীহট্টের কোন শহরে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র জয়ন্তীর কোন সাড়া নাই। শুধু আর্ত্তের সেবা, পরোপকার বা স্বাধীনতা লাভ করিবার স্পৃহা থাকিলেই কোনও সঙ্ঘ সমিতির কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। ব্রতী বালক সমিতির উদ্দেশ্য কি — উহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় নাই — তথাপি এই সামান্য সময়ের মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে উহার আদর্শ মহান। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই দেখিয়া আমি বাস্তবিকই আনন্দ লাভ করিয়াছি। ব্রতী বালকগণের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রতি ঘরে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পৌঁছাইয়া দেওয়া। যদি রবীন্দ্রনাথের এ জয়ন্তী উৎসব জয় - যুক্ত করিতে হয় তবে কবি বর্তমানে রাশিয়া হইতে যে আদর্শকে নিয়া আসিয়াছেন সেই আদর্শ গ্রামে গ্রামে প্রচার করা কর্ত্তব্য'। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও জয়ন্তী উৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

অতঃপর বিদায় সঙ্গীতের পর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৩৩৭ বাংলার ২৫শে বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৩১ ইংরাজিতে ৮ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে 'রাশিয়ার চিঠি' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ঠিক এক মাসের মাথায় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঢাকাদক্ষিণে রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছিল। ভাবলে অবাক হতে হয়, রাশিয়ার বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার ইতিবাচক দিক থেকে শিক্ষা গ্রহণের যে অবকাশ আছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ঈশান বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে কত দ্রুত আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে পরদিন মঙ্গলবার অশোকবিজয় সিলেট শহরের কাছেই খাদিনগর চা বাগানে নিজের আবাসে ফিরে গেলেন। গিয়েই চিঠি লিখে নিজের আনন্দ উজাড় করে দিয়ে জানালেন ঃ

আজ বেলা আন্দাজ দু'টোর সময় আমার এই শৈল ভবনে এসে পৌঁছেছি অবশ্য পথে শহরে প্রায়

> ঘণ্টা-দুই কাল এবং টিলাগড়ে প্রোফেসর সুরেশ সেনের বাসায় আমরা দেড় ঘণ্টা কাল কাটিয়ে এসেছি। আমার শহরের দু'তিনজন বন্ধুকে ব্রতী বালক সমিতির 'কবি-প্রণামে'র এক একটি করে copy বিতরণ করে এসেছি। প্রোফেসর সেন আমাকে বারবার করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তীর সমগ্র বিবরণ জেনে' নিয়েছেন। তাঁর এত আনন্দ হয়েছে, যে সে আর কী বলব। ...
>
> এখন বাড়ির কথাগুলো কেবলই বারবার করে ফিরে ফিরে মনে পড়ছে। আশ্চর্য্য! এই দু'টো দিন বইতো নয়! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এবারকার এই দু'টো দিনেই আমাদের গ্রামের সঙ্গে যেন আমার একটা নতুন পরিচয় হয়ে গেছে।....
>
> জগতের যাবতীয় উচ্চদর্শন আমাদের advice দিচ্ছে — 'Judge a person not by his actual, but by his ideal'। আমার মনে হয় আমি এবার আমাদের সমিতির ছোট ছোট ছেলেদের কার্যকলাপ থেকে এমন একটা ideal এর ইঙ্গিত পেয়েছি, যা' বাস্তবিকই অদূর ভবিষ্যতের আমাদের গ্রামের জন্য একটি অভিনব গৌরব এনে দিবে। লেখাপড়া তো ঢের লোকেই করে থাকে, কিন্তু কালচার কয়টা লোক করে? পুঁথিপড়া আর কালচারের মধ্যে রাতদিন বেশ কম রয়েছে যে। আমার বিশ্বাস আমি এবার সমিতির ছেলেদের মধ্যে কালচারের একটি নতুন আগ্রহ স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই নতুন ক্ষেতে আপনাদের এই প্রথম চাষে সোনার ফসল হোক। আশা করি আপনারা চিরকালের 'বিজ্ঞ'দের মত কেবল সারের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখবেন না, রস বর্ষণের প্রয়োজনটাও যে এই অঙ্কুরগুলোর যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, এ কথাটা আপনারা বিশেষ করে মনে রাখবেন।
>
> সামনের ওই পাহাড়ে নদীর পারে অলস অপরাহ্নের রৌদ্রালোকে আমার চোখের সামনে কাল সন্ধ্যার সমস্ত উৎসবটা আবার নতুন করে ভেসে উঠেছে। বিশেষ করে মনে পড়ছে ঐ ভেঁপু-ছেলেটাকে। কি করলে ও! ও কি ভেবেও দেখলে না, কার হাতে ওর এই অত স্বল্পায়ু তালপাতার ভেঁপুটা তুলে দিচ্ছে। যে-বাঁশিটা আজ সত্তর বৎসর ধরে বেজে বেজেও শ্রান্ত হলো না, তার সমান কি হলো ওর ওই অতি তুচ্ছ পাতার ভেঁপুটা, যা' দশ বিশটা ফুঁ-এর পরেই অবশিষ্ট চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়? ভাবলে হাসি পায়, ও ছেলেটা এ করলে কি গো! ও কি বয়সের অমিলটাকেও একবার বিবেচনা করলে না? বুড়োতে-ছেলেতে, বাঁশিতে-ভেঁপুতে ও যে একেবারেই ভেদ রাখতে চায় না! ভয় হয়, ও হঠাৎ কখন বলে বসবে বা, "বাজাও না গো কবি আমার ভেঁপুটা, আমি ততক্ষণ তোমার বাঁশিটাতে ফুঁ দিয়ে দেখি। তারপর রোদ পড়লে ও বেলায় মাঠের পারে আমরা চোর-চোর খেলতে যাবো' খন।

ব্রতী বালক সমিতির পক্ষ থেকে অশোক বিজয় রাহা 'কবি-প্রণাম' শীর্ষক যে প্রশস্তি প্রস্তুত করেছিলেন, জয়ন্তী উৎসবে তা পাঠ করেছিলেন বীরেশ কুমার মিশ্র, এ কথা আগেই বলা হয়েছে।[৩] প্রশস্তি কবিতাটি এখানে সংযোজিত 'ব্রতী' পত্রিকার প্রতিলিপিতে যদিও আছে, তবু পুনরাবৃত্তি করছি।

### কবি-প্রণাম

অস্তরবির বিদায়-গোধূলি নামিবে কখন দিনের শেষে;
দীর্ঘপথের যাত্রীর মুখে চাহি আজি মোরা নির্নিমেষে।

হে কবি, তোমার স্বর্ণবীণায় পুরবীর গান উঠিল বাজি',
দীর্ঘদিনের যাত্রার পারে কে তোমারে বল' ডাকিছে আজি!
চারিদিক হতে শ্রান্ত গগন ভরিয়া উঠিছে দীর্ঘশ্বাসে,
উদার তোমার শান্ত নয়নে কোন সুদূরের বেদনা ভাসে।
অসীম নীরবে শূন্য প্রহর কিরণ-প্লাবনে উঠিছে ভরি',
স্বর্ণ রবির শান্ত আলোকে হে কবি, তোমার প্রণাম করি।

### ২

দাঁড়াও, দাঁড়াও, পান্থ, দাঁড়াও ক্ষণেক তোমার পথের 'পরে,
চেয়ে দেখ' ঐ আননে কাহার বেদনার ছায়া উঠিছে ভরে।
বহুদূরে কোন প্রান্তর পারে বাজিছে ব্যথার করুণ বাঁশি,
অশ্রু-আতুর ক্রন্দন খানি হৃদয়ের পারে আসিছে ভাসি'।
ঐ হের কবি, স্থলে জলে আজ গভীর বিষাদ গিয়েছে ছেয়ে,
কাহার করুণ আকুল মিনতি নীরব আকাশে উঠিছে বেয়ে।
বনের শাখায় মর্মরি' উঠি' রুদ্ধ পবন যেতেছে ছুটে',
সহসা চমকি' বীণাখানি তব তন্দ্রে তন্দ্রে কাঁদিয়া উঠে।

### ৩

এই সে ধরণী, যার ঘাটে ঘাটে ভাসিছে তোমার সোনার তরী,
রজনীর শেষে যাহার আকাশ প্রভাতের গীতে দিয়েছ ভরি',
যার তটিনীর এ-পারে ও-পারে ভাসাইছ তব সুরের খেয়া,
বরষার সাঁঝে তব আহ্বানে ছুটে' আসে যার বনের কেয়া,
এই সে ধরণী, — প্রতি বসন্তে ফুটাইছে তব গানের কলি,
গভীর আবেগে ভরিয়া তুলেছে তব হৃদয়ের গীতাঞ্জলি।
এই সে ধরণী চেয়ে আছে ঐ অস্ত-দিনের সূর্যালোকে,
বেলা চলে যায় দীর্ঘছায়ায়, — আলো ভেসে' যায় শূন্যচোখে।

### ৪

হে কবি, তোমার গানের কণ্ঠে সকল ভুবন গিয়াছে ছেয়ে',
তব সঙ্গীতে বঙ্গ-ভবনে বিশ্বমানব আসিছে ধেয়ে',
বঙ্গবাণীর অঙ্গনে আজি বিশ্ববাণীর পূজার বেদী,
নবীন প্রভাত আনিয়াছ তুমি অন্ধ নিশার তিমির ভেদি'।
সুন্দর আসি দেখা দিল হাসি' নয়নে তোমার মুরতি ধরি',
চারিদিকে নব রূপের আলোকে নবীন ভুবন উঠিল ভরি'।
জোড় করি' কর বিশ্বদেবের বন্দনা গান গাহিলে তুমি,
ধন্য হইল গঙ্গার তীর, পুণ্য হইল বঙ্গভূমি।

৫

পান্থ, বারেক দাঁড়াও দাঁড়াও! — যাত্রা তোমার সিন্ধু পারে, —
বাহিরে ছুটিয়া এসেছি আমরা, মিলেছি তোমার পথের ধারে;
নটরাজ ঐ কতো-যে নৃত্যে নাচিয়া ফিরিছে বিশ্বমাঝে,
সে নৃত্যতাল শুনেছি আমরা তোমার বীণার ছন্দে বাজে।
শুনেছি তোমার কণ্ঠে আমরা মৃত্যু জয়ের অমৃত বাণী,
চিত্তলোকের শ্রেষ্ঠ যে দান, আমাদের তুমি দিয়েছ আনি'।
হৃদয়ে তোমারে পেয়েছি আমরা হৃদয় মোদের নিয়েছ হরি', —
আমাদের মাঝে ক্ষণেক দাঁড়াও, হে কবি, তোমারে প্রণাম করি!

আরেকবার স্মরণ করা যাক, এ বড় কম কথা নয়, ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়িতে সপ্ততিতম রবীন্দ্র-জয়ন্তী-দিবস উদযাপিত হয়েছিল পঁচিশে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ তারিখে, অর্থাৎ ১৯৩১ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর শ্রীহট্ট শহরে ১৩৩৮-এর পৌষমাসে যে বিরাট জয়ন্তী-উৎসব হয়, তার তারিখ ছিল খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসাবে ১৯৩১ সালের ২০, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ; শিলচর শহরে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর তারিখ ছিল ২৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯৩১; আর কলকাতায় 'রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পরিষদ'-এর ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম অনুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয় টাউন হলে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩১ তারিখে।

**পাদটীকা ঃ**

১. এই অনুচ্ছেদ ও এর পরবর্তী অনুচ্ছেদে প্রদত্ততথ্যাদি 'ব্রতী' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সভাপতির অভিভাষণ' থেকে সংগৃহীত।

২. ঢাকাদক্ষিণ মিশ্রপাড়ার প্রতিবেশী গ্রাম কানিশাইলের বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে সত্যেন্দ্র (চন্দ্র?) ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯০৯ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৩ সালে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিলেট এম.সি. কলেজ ও গৌহাটি কটন কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার পর ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনের শেষদিকে প্রথমে উড়িষ্যা ও পরে পশ্চিমবঙ্গের একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করে অবসর লাভ করেন ১৯৬৭ সালে। শেষ জীবন কাটে কলকাতার কাছেই বিরাটির নবাদর্শ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটিতে। (ভট্টাচার্য, রামরঞ্জন : ২০৯)।

৩. 'কবি-প্রণাম' রচিত ও পরিবেশিত হওয়ার পরে শ্রীহট্ট শহরের সুধীর সিংহ ও অন্যান্য রবীন্দ্রানুরাগীদের অনুরোধে অশোক বিজয় শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী উৎসবের জন্য কবিগুরুর উদ্দেশ্যে 'নমস্কার' নামে আরেকটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।

## সংযোজন

প্রাচীন ইতিহাসে প্রাচ্য ভারতে প্রাগজ্যোতিষ-কামরূপ ব্যতিরেকে রাজ্যশাসনের একক হিসাবে আর যে সব অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি মুখ্যত পুণ্ড্রদেশ, রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, হারিকেল ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে করতোয়ার পূর্বদিক এবং ব্রহ্মপুত্র-পদ্মার সঙ্গমস্থলের উত্তর-পূর্বে সুবিস্তৃত অঞ্চলের একটি সাধারণ নাম ছিল কামরূপ। তৎপরবর্তী সময়ে, মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে 'বঙ্গদেশ' বলতে বোঝাতো পদ্মা-বিধৌত পূর্ব বাংলাকে। আর, পশ্চিম বাংলার সাধারণ নাম ছিল 'গৌড়'।

ব্যাপক অর্থে গৌড়ের অংশবিশেষ ছিল রাঢ়, কিংবা উত্তরের বরেন্দ্রভূমি।

ইতিহাসের বিবর্তনে ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে আধুনিক রাজনৈতিক ভূগোলের যে রূপরেখা ধীরে ধীরে তৈরি হয়, সেখানে বাংলাদেশের প্রধান দুটি ভাগ — পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা। যদিও এ কথাটি সকলেই জানেন যে রাজনীতির ভূগোল আর ভাষা-সংস্কৃতির ভূগোল এক নয়, তবু শাসনকার্যে মান্যতা প্রাপ্ত বিভাজনের সূত্র ধরে পূর্ব বা পশ্চিম বাংলার বাইরে যে বাঙালি বসবাস করেন, তারা প্রবাসী বাঙালি বলেই দুর্ভাগ্যত স্বীকৃত হন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর যে বাংলা ব্রিটিশ অধিকারে আসে, ত্রিপুরা, কুচবিহার, জয়ন্তিয়া এবং শিলচর-কেন্দ্রিক বরাক উপত্যকা ঐ বাংলার অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু কুচবিহার ব্যতীত বাকি পশ্চিম বাংলা, জয়ন্তিয়া রাজ্যের বাইরে বাকি বাংলাদেশ, এবং বর্তমানে আসামের বরাক উপত্যকায় সন্নিবিষ্ট করিমগঞ্জ জেলা কিংবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত ধুবড়ি এবং গোয়ালপাড়া জেলা নবাব সিরাজউদ্দৌলা শাসিত বাংলা সুবার অংশ ছিল। ১৮২৬ সালে ব্রহ্মদেশীয়দের আক্রমণে বিপর্যস্ত আহোম - শাসিত আসাম রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে আসে, এবং এর পর ক্রমশ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত হয়। ব্রিটিশ শাসনে যাওয়ার আগে উত্তর-পূর্ব ভারতে (উপজাতি অধ্যুষিত ছোট ছোট পরিসরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এক বা একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম - রাজ্যের বাইরে) অপেক্ষাকৃত বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল — আসাম, হেড়ম্ব, জয়ন্তিয়া, কুচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুর। ব্রিটিশ অভিভাবকত্বে কুচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুর ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত রাজন্যশাসিত থেকে যায়। কিন্তু ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ধুবড়ি-গোয়ালপাড়া এবং করিমগঞ্জ-সহ সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা বাংলার রাজ-সীমা হতে নির্বাসিত হয়ে বৃহত্তর আসামের শ্রীবৃদ্ধি করে। হেড়ম্ব ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের আলাদা সত্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই অবলুপ্ত হয়, কেননা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সুবিধার্থে ঐ দুই রাজ্যকে আসামের অঙ্গীভূত করে নেয়। বাঙালির স্বাজাত্যবোধ তখনও গড়ে ওঠেনি, যে কারণে মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, ১৮৭৪ কালীন সময়ে ধুবড়ি-গোয়ালপাড়া বা করিমগঞ্জ-সহ সমগ্র শ্রীহট্ট জেলাকে বাংলা থেকে ছেঁটে ফেলে আসামের রাজনৈতিক মানচিত্রে ঢোকানো হলেও সেই উন্মাদনার ছিটেফোঁটা খুঁজতে গিয়ে হয়রান হতে হয়। ১৮৯৬ সালে লেখা 'বঙ্গমাতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন — 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি'। বঙ্কিমের 'বাঙালি' রবীন্দ্রনাথের হাতে 'বাঙালি' হল, আর এখনও তাই-ই আছে। তবে ১৮৭৪-এ সে আর যাই হোক, তখনও বাঙালি হয়ে ওঠে নি। সুতরাং শ্রীহট্ট ও শ্রীহট্টীয় সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় অবজ্ঞা এবং অবজ্ঞা থেকে অবহেলা।' সংস্কৃতি ও রাজনীতির মানচিত্র আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রীহট্ট ও শ্রীহট্টীয়দের ক্রমশ এক স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে ওঠে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৬-৭৭ সালে সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যদের উদ্যোগে কলকাতায় 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা অতএব অস্বাভাবিক ছিল না। ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত ঢাকাদক্ষিণ সহ সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময়ে বাংলা যেমন ভাগ হয়েছিল, তেমনি আসামকেও ভাগ করা হয়েছিল। করিমগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি থানাকে বাদ দিয়ে গোটা শ্রীহট্ট জেলা প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রিটিশ যুগের অনেক আগে থেকেই হেড়ম্ব, জয়ন্তিয়া, কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজ-ভাষা ছিল বাংলা এবং লোক-ভাষার বৈচিত্র ছিল উল্লেখনীয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রাচীন জয়ন্তিয়া রাজ্যের সমতলীয় অংশ বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত (আর, পার্বত্য অংশ ভারতবর্ষের মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্গত),

কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গে স্থান পায় এবং ত্রিপুরায় অন্যতম রাজভাষা হিসাবে বাংলার মহিমা অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, কিন্তু শিলচর-কেন্দ্রিক কাছাড় জেলা যা হেড়ম্ব রাজ্যের অংশবিশেষ, সেখানে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষে **১৯৬১** সালের **১৯**শে মে তারিখে বাংলা ভাষার বেদী-তলে একাদশ শহীদ আত্ম-বলিদান করেন। রাজনৈতিক ভূগোলের ঘূর্ণাবর্তে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার তৃতীয় ভুবন, পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার সীমারেখার বাইরে, রাজনৈতিক দিক থেকে অবয়বহীন, ঈশান বাংলা, যেখানে বাঙালি আদৌ প্রবাসী নয়, এভাবেই লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। আর, দেশভাগের ফলে যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ঈশান বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, ও আগে থেকেই যাঁরা এখানে ছিলেন, তাঁদের সকলের বাঙালি পরিচয়টুকুও আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি।

রবীন্দ্রনাথের সতরতম জন্মজয়ন্তীতে ঢাকাদক্ষিণে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে ‘ব্রতী’র নিজস্ব প্রতিবেদনে যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, তার উল্লেখ করছি। বলা হয়েছিল —

> আজ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব করিতে পারিয়া ঠাকুরবাড়ি ব্রতী বালক সমিতি ধন্য হইল। **১৩৩২** বাংলার আশ্বিন মাসে প্রথম যখন এই সমিতি প্রতিষ্ঠার কল্পনা জাগে তখন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া শান্তিনিকেতনের ব্রতী বালক সমিতির নামানুসারেই উহার নাম রাখা হয় ‘ব্রতী বালক সমিতি’। তাঁহার জন্মোৎসবের আয়োজন করিতে পারিয়া ‘ব্রতী বালক সমিতি’র জন্মও সার্থক হইয়াছে।
>
> আমাদের নাকি একটা মস্ত বড় দোষ আছে যে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে জানি না। আজ জগতের কাছে আমাদের এই ভুল ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে — ভাঙ্গাইবার দিন আসিয়াছে।

বাতিঘরের দিকে তাকিয়ে ঈশান বাংলায় আজ দিগনির্দেশের দরকার; রবীন্দ্রনাথের সার্ধ শতবর্ষ ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচশো বছরকে উপলক্ষ করে আমরা চিত্তের দীনতা ও পারস্পরিক অসূয়া থেকে মুক্তিলাভ, এবং অহেতুক সেবাকর্ম্মে মনোনিবেশের লক্ষ্যে সুতরাং ভুলের পুনরাবৃত্তি আর করব না এই সৎসঙ্কল্পের পুনরুচ্চারণ অন্তত করতেই পারি।

**পাদটীকা ঃ**

১. বিপ্লবী হেনা দাসের আত্মজীবনী থেকে এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। **১৯৩৭**-এ যখন তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, তখন কলকাতার আলিপুরে বেলভিভিয়ার প্যালেসে নিখিল ভারত গার্লস গাইড সংগঠনের সমাবেশ ও শিবিরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সমাবেশে লেডি ব্যাডেন পাওয়েল এসে ভাষণ দিয়েছিলেন। হেনা দাস লিখেছেন —

> আমরা ছিলাম আসাম প্রদেশের প্রতিনিধি। এর মধ্যে আমরা সিলেট-কাছাড়ের প্রতিনিধিরা মিলে সুরমা উপত্যকার পৃথক একটি তাঁবু খাটিয়েছিলাম এবং এর পাশেই আসাম উপত্যকার আর একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। প্রথম দিনই যখন আমরা সবকিছু গুছিয়ে নিজেদের মাঝে সিলেটি ভাষায় গল্পগুজব করছিলাম, তখন দেখি আমাদের দরজার সামনে বেশ বড় রকমের একটি ভিড় জমেছে। কেউ কথা বলছে না কিন্তু কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে এবং আমাদের কথাবার্তা শুনছে। আমরা ভাবলাম ওরা বোধ হয় সব শিবির দেখতে বেরিয়েছে এবং সবার সাথে ভাব করাটাই ওদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ওদের ওই নীরব কৌতূহলী চাহনিটা আমাদের ভাল লাগছিল না, যেন চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার দেখছে মনোযোগ দিয়ে। আমরাই তখন ভদ্রতা করে ওদের আমন্ত্রণ জানালাম ভেতরে আসার জন্য, শুদ্ধ বাংলা ভাষায় আমরা কথা বললাম। আমাদের ভদ্রতা ও শুদ্ধ বাংলা ভাষা বলার ক্ষমতা দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ওরা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, ওমা, একি! তোমরা তো দেখি খুবই ভদ্র এবং দিব্বি বাংলা বলতে পার! আমরা তো শুনেছি আসাম থেকে এসেছে কিছু

জংলীভূত, তাই জংলীভূত দেখার জন্যই আমরা এখানে ভিড় করেছি। ওদের অজ্ঞতায় ও আচরণে সেদিন খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম (দাস, হেনা : ১৪১)।

সাম্প্রতিককালে বরাক উপত্যকার কবি দিলীপকান্তি লস্কর লিখেছেন ঃ

> আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে যখন বললাম ঃ
> করিমগঞ্জ, আসাম;
> তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন ঃ বাঃ, বেশ সুন্দর
> বাংলা বলছেন তো!
> একজন শিক্ষিত তথা সাহিত্যিকের যখন এই ধারণা, তখন
> আমি আর কি বলতে পারি;
> ওঁকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম ঃ
> বাংলাভাষার তেরো শহীদের ভূমিতে আমার বাস।
> তখন তিনি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে ভিরমি
> খাইয়ে দিয়ে বললেন ঃ
> ও ! বাংলাদেশ ? তা-ই বলুন। (লস্কর ঃ ১২)

# শিলচরে রবীন্দ্র অনুষ্ঠান : সংক্ষিপ্ত সমীক্ষণ

ড. মনুজেন্দ্র শ্যাম

রবীন্দ্রনাথের গান নৃত্য আবৃত্তি নাটক করাকেই শুধু রবীন্দ্রচর্চা বলে আখ্যায়িত করলে চর্চার যথার্থতা প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্র সৃষ্টির আলোচনা, বিশ্লেষণ ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই রবীন্দ্র চর্চার যথার্থ প্রকাশ।

শ্রীহট্ট ও শিলচর থেকে অনেকেই কলকাতায় পড়তে যেতেন, বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে এবং বাংলার নবজাগরণের প্রভাব তাঁদের আলোকিত করেছিল ও এতদঞ্চলে পরবর্তীকালে তাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম 'ভবিষ্যৎ' পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁরই সম্পাদনায়। এই পত্রিকা তখনকার সময়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ও সাহিত্য আলোচনার একমাত্র মাধ্যম ছিল। ১৯২৫ সালে শিলচর নর্মাল স্কুল থেকে 'শিক্ষা সেবক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা মূলত ছিল শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার মাধ্যম। রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে একটি সংবাদ ১৩৩৫ 'ভবিষ্যৎ' সম্পাদকীয় থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে— 'বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির সহিত যোগ রক্ষা করার জন্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্তের বাসায় একটি সান্ধ্য বৈঠক বসে। স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিলে লেখাপড়ার প্রয়োজন বোধ এ দেশের কম লোকেরই থাকে। এই মানসিক অবসাদ ও আরামপ্রিয়তা হইতে মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান পিপাসাকে বাঁচাইয়া রাখা বা উজ্জীবিত করা এই বৈঠকের উদ্দেশ্য'। বৈঠকের অলিখিত নাম 'রবীন্দ্র সংঘ'। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ও হেমচন্দ্র দত্তের যৌথ উদ্যোগে 'রবীন্দ্র সংঘ' স্থাপিত হয়েছিল। বিশ ও ত্রিশের দশকে শিলচরে ঘরোয়া পরিবেশে নাটক সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হত। সেই সময়ের একটি সংবাদ ১৩৩৪ বাংলা শুক্লপক্ষ কার্তিক ১ম সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করছি, — 'শেষ বর্ষণের পর বঙ্গজননীর সদ্যস্নাত শোভাকে বরণ করার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত উকিলের বাসায় ছেলেমেয়েরা 'শরৎ আহ্বান' নাম দিয়া লক্ষ্মীপূজার পরদিন এক নৃত্যনাট্য অভিনয় করিয়াছে। রবিবাবুর 'শেষ বর্ষণ' ভাষান্তরিত না করিলেও কতকটা রূপান্তরিত করিয়া তারা সুন্দর আবৃত্তি ও গানের ভিতরে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছে এবং আমাদিগকেও করিতে সাহায্য করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মাঝখানে দেবতার যে প্রকাশ তাহা বাদ দিয়া দেবপূজা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়। নীতিকথার মত ভগবানের নাম ও অনেকেই নিয়া থাকেন, কিন্তু এই ছেলেমেয়েদের ন্যায় বিশ্ব দেবতার পূজা খুব কম লোকেই করেন। কাউর উপর 'ঈশ্বরকে প্রেম কর' ইত্যাদি নীতি কথার ঘা না দিয়া হেমবাবু যে তাহার ছেলেমেয়েদের জন্য এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, তারজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রবীনাথের সাধনা কলকাতার সীমা ছাড়াইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।'

বিশ ও ত্রিশের দশকে আমাদের বাড়ির উঠানে স্টেজ বেঁধে নাচ গান ও নাটকের অনুষ্ঠান হত। মা-মাসিদের শাড়ি, বিছানার চাদর ইত্যাদি দিয়ে স্টেজ তৈরি করা হত। এবং দুদিকে দুটি পেট্রোমাক্স ও বড় বড়

লণ্ঠন রাখা হত দাদা দিদি মাসিরা ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা অনুষ্ঠান ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করত। একবার শারদোৎসব হয়েছিল মুক্ত প্রাঙ্গণে।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তখন রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ হতে আরম্ভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৪ বাংলার শুক্লপক্ষ শ্রাবণ ১৬শ সংখ্যার একটি সংবাদ উল্লেখ করছি, — ‘বাংলার রঙ্গমঞ্চ এত কাল পর রবীন্দ্রনাথ দখল করতে শুরু করলেন, সেই কোন যুগের পুরানো লেখার রস বুঝতে আমাদের অর্দ্ধশতাব্দী লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ চেনাসুরে গানে গানে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার তখন রাগ।’

সেই সময় মেয়েদের মুক্ত মঞ্চে নাচ গান নাটক করা নিন্দনীয় ও সমালোচনার বিষয় ছিল। রবীন্দ্র সাহিত্যের উপলব্ধি ও চেতনা সম্পর্কে ১৩৩৫ বাংলার কৃষ্ণপক্ষ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় একাদশ সংখ্যা ভবিষ্যৎ পত্রিকার একটি সংবাদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, — “১৭ই জুন সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মহাশয়ের বাসায় বালিকাদের ‘বাসন্তিকা’ অভিনয় দেখিলাম। আজকাল মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ও নৃত্য ভাল কি মন্দ, ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়টি নিয়া ‘সঞ্জীবনী’ ও ‘প্রবাসী’-র প্রবীণ সম্পাদকদের মধ্যে মতদ্বৈত দেখা যাইতেছে। ঠিক এই সময় শিলচরে বালিকাদের অভিনয়ের প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনায় শিলচরের শিক্ষিত সমাজ যে অনেকটা সময় ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বিমলবাবুর বাসায় রওয়ানা হইয়াছি, পথে এক জায়গায় অপেক্ষা করিতেছি, এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, ‘মেয়েদের অভিনয় সম্পর্কে আপনার মত কি?’ এই বিষয় নিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে যে আলাপ হইয়াছে, তাহা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। সে দিনের অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি, এতেই আমাদের মতামত বুঝা যাইবে।

“সেদিনের অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় নয়, পিতামাতা ও পরিবারের হিতৈষী বন্ধু বান্ধবরাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, বালিকারা তাহাদের সাক্ষাতেই অভিনয় করিয়াছেন। মোটামোটি ইহা একটি পারিবারিক ব্যাপার। বালিকাদের অভিনয়ে সেদিন কোনো কৃতিত্ব দেখিনাই এ কথা বলিতে পারি না, তবে আমরা তাহাদের অভিনয়-কলা কুশলতা দেখিয়া তৃপ্তিলাভের জন্য যাই নাই, এবং এ সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছাও করি না। আমরা আনন্দিত হইয়াছি তাহাদের ‘সৌন্দর্যবোধের’ উদ্যম দেখিয়া। প্রকৃতির সমতুলীলার মধ্যে যে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ তাহা অভিনয় কলার সহায়তায় উপলব্ধি করিতে চাওয়ার মধ্যে আমরা অন্যায় কিছুই দেখিতে পাই না। আর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, এ যাহারা বুঝে না বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না, সঙ্গীত-কলা কেবল মাত্র সাময়িক আমোদ ও অবসর বিনোদনেই পর্যবসিত বলিয়া মনে করেন, তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় অভিনয়ের প্রতিকূল সমালোচনা করাই স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্য উপলব্ধি যাহাদের মদের নেশার মতই একটি তীব্র উত্তেজনা মাত্র তাদের সাক্ষাৎ বালিকাদের এই জাতীয় অভিনয় উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মত। রবীন্দ্র সাহিত্যে Pantheism (প্রকৃতি পূজা) এর একটি অভিনব প্রকাশ আমরা ফাল্গুনীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা কবিবরের সাহিত্যের ভিতরে এই বিষয়টি অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারাই বিমল আনন্দের স্পর্শ লাভের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। নানা দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া অনন্তকে জীবনে অনুভব করিয়াছেন ‘অজিতকুমার রবীন্দ্র সাহিত্যে এই জিনিসটাকে ‘রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি’ আখ্যা দিয়াছেন। এইটুকুই এখানে বলিতে চাই যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় ‘বাসন্তিকা’ রচনা করিয়াছেন ‘ফাল্গুনী’ ইঙ্গিত অবলম্বনে। এই প্রকার নাটিকার অভিনয়ে সামাজিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। সাহিত্য জাতিকে কি ভাবে উন্নত ও সমাহিত করে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি।”

১৯১৯ সালে ১১ই নভেম্বর সকাল বেলা ৮টায় শ্রীহট্ট কলেজ হোস্টেলে (মুরারীচাঁদ কলেজ)

রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিয়েছিলেন জনৈক কবি শিষ্য কর্তৃক অনুলিখিত বক্তৃতাটি ‘ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ’ নামে ভবিষ্যৎ শুক্লপক্ষ আশ্বিন ১৩৩৪ বাংলা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য : কবিবরের বাণী চিরনতুন। আজ সাত বৎসর পর ইহা প্রকাশ করার একমাত্র কারণ। কবির এই ভাষণের সারমর্ম ‘আকাঙ্ক্ষা’ নামে শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ বাংলার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ‘আকাঙ্ক্ষা’ বা অনুলিখিত উপদেশবাণী কোনোটাই রবীন্দ্র রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি।

এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। সুরমা-বরাকের (৩১ কালীন সুরমা উপত্যকা) সাহিত্যিক ও কবি রসময় দাস, অশ্বিনীকুমার শর্মা, সরোজ কুমার সেন, ভূপেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, কামিনীকুমার অধিকারী, বানেশ্বর সিংহ, অনিলকুমার চন্দ্র, ক্ষীরোদ বিহারী সোম প্রমুখ ও অন্নদাশঙ্কর রায়, অখিল নিয়োগী, ড° মনীন্দ্রলাল বসু, অনিলকৃষ্ণ সরকার প্রমুখদের লেখা প্রকাশিত হত। ভবিষ্যৎ পত্রিকা এই উপত্যকায় রবীন্দ্র অনুধ্যান ও চর্চার অগ্রপথিক বলা যেতে পারে।

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সারা ভারত ব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তীর সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিলকুমার চন্দ্র ও নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের উদ্যোগে রবীন্দ্রজন্মোৎসব ১৯৩১ সালের (১৩৩৬ বাংলা) পৌষমাসে শিলচরে RDI (Reading and Dramatic Institute) হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল অভিনীত হয় ও সুরমা-বরাকের কন্যা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী কুন্দরাণী সিংহ ও ফুল্লরাণী সিংহ দুই বোন রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করেন। এই নৃত্য উপস্থাপনা শিলচরে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের প্রথম নৃত্যানুষ্ঠান। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে নৃত্য ও সংগীতও শিক্ষা নেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কিশোরী কুন্দরাণীকে কুন্দকলি বলে আখ্যায়িত করে তাঁর অটোগ্রাফ খাতায় লিখে দিয়েছিলেন ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এই কবিতাটি—

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা
সুন্দর আনন্দ বহে প্রকাশের সুন্দর এক বাধা।।

২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুন্দরাণী সিংহ ও ফুল্লরাণী সিংহ শ্রীহট্টের বারিশাল গ্রামের স্বনামখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী তেজস্বী ও নির্ভীক সাংবাদিক Sylhet Chronical এর সম্পাদক ও Hindustan Standard এর সম্পাদক শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহের কন্যা।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ‘কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ ও রস’ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ‘রূপ ও রস’ সুরমা উপত্যকা থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র কবিতা আলোচনার প্রথম গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এর পূর্বে শ্রীহট্ট থেকে উপেন্দ্রচন্দ্র কর গীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতিবাদ নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন।

এই বছরই ১৯৩১ সালে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা সংগঠন ‘বাণী পরিষদ’ স্থাপন করেন। এই সংস্থায় চারুকলা নৃত্য পুরাতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হত। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম ও ড° রাধারঞ্জন চৌধুরী। নীরদবরণ গোস্বামী, পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য, সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য, কামিনীকুমার অধিকারী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম প্রমুখ সদস্য ছিলেন। সংস্থার কোনো স্থায়ী সভাপতি ছিলেন না। বৈঠকের দিন সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচিত করা হত। কলকাতা থেকে অনেকেই বিভিন্ন বিভাগে সরকারি কাজে নিযুক্তি নিয়ে আসতেন, তাঁরা আমন্ত্রিত অতিথি রূপে বৈঠকে যোগদান করতেন। নতুন সদস্যদের রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হতো প্রথমদিনের সভায়। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ

করছি। ১৯৩৪ সালের ঘটনা। অমিয়া দাস (আমার মাসি) কলকাতার বেথুন কলেজে আইএ পড়তেন। তিনি পূজার ছুটিতে শিলচরে এসেছিলেন। বাংলা পাঠ্যসূচিতে গীতাঞ্জলির কবিতা,

প্রভুগৃহ হতে আসিলে সেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো
বিপুল বল।

বাণী পরিষদের বৈঠক আমাদের বাসভবনে চলছিল, অমিয়া দাস গানের অন্তর্নিহিত ভাব জন্মাবার জন্যে বৈঠকে উপস্থিত হন। বিভিন্ন সদস্য নানা মত প্রকাশ করতে থাকেন। তখন স্থির হল রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে মর্মার্থ জেনে নিতে হবে। অমিয়া দাস চিঠি লিখে উত্তর পেলেন। চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

ওঁ
Uttarayan
Santiniketan Birbhum
কল্যাণীয়াসু
"প্রভুগৃহ হতে আসিল যেদিন
বীরের দল।"
ইতি শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গীতাঞ্জলিতে আছে
'প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল,

কিন্তু চিঠিতে লিখেছেন প্রভুগৃহ হতে আসিল, আসিলে লিখেন নি। বাণী পরিষদ প্রতি বছর নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করতো। তখন নাগরিকদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করা হতো না। বাণী পরিষদের অনুষ্ঠানেই নাগরিকরা উপস্থিত হতেন। এই সংস্থার কর্মবীর ও প্রচেষ্টা গত শতকের পাঁচের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নারীকল্যাণ সমিতি প্রতিবছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করতো। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ মালতী শ্যামকে চিঠি দিয়েছিলেন। তা উদ্ধার করছি :

কল্যাণীয়াসু

আমার জন্মদিনে তোমরা যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছ জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ বাংলা

অনুষ্ঠানসূচিতে গান নৃত্য আবৃত্তি অভিনয় প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি থাকতো। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি নৃত্যে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা পরিবেশিত হয়েছিল। নতুন আঙ্গিকে কবিতা নৃত্য ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হত। 'নকলগড়' কবিতা একক অভিনয় ও আবৃত্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছিল। 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি— গানটি অভিনয় করে প্রদর্শিত হয়েছিল। জাপানের কবি নগুচি ও

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার অভিনয় করে পরিবেশিত হয়।

সেই সময় কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা খুব কঠিন ও দুরূহ ছিল। মেয়েদের অভিভাবকরা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠান করতে দিতে চাইতেন না বা দ্বিধাগ্রস্ত থাকতেন ও যারা আসতেন তাদের জন্য আবার প্রস্তুতি পর্ব ছিল। অনুষ্ঠানের পক্ষকাল আগে rehearsal চলতো আমাদের বাড়িতে।

১৯৩৮ সালে মালতী শ্যাম নারীকল্যাণ সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি অখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের (All India Women's Conference) প্রথম শাখা রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৭২ সালে শিলচরে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন শিলচরে অনেক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মানুষ ও ব্রাহ্মানুরাগী নাগরিক ছিলেন। বাংলাদেশ (স্বাধীনতা পূর্ব বঙ্গদেশ) থেকে কার্যোপলক্ষে ও সরকারি চাকুরি নিয়ে এখানে আসতেন। তাদের সঙ্গে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। উপাসনা কালে মাঘোৎসবে বা কোনো অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অন্যান্য রচয়িতাদের ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হত। শিলচরে যখন ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল অতিক্রম করেন নি। রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীত দীর্ঘকাল পর সমাজের উপাসনা ও অনুষ্ঠানে গাওয়া আরম্ভ করে। তখন রবীন্দ্রনাথের গানকে বলা হত 'রবিবাবুর গান'।

ত্রিশের দশক থেকে শিলচরে প্রথাগত ভাবে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষকরা বাড়িতে এসে গান শেখাতেন। কুন্দরাণী ও ফুল্লরাণী সিংহ যখন তাঁদের মেসোমশাই রায়সাহেব দীননাথ দাসের উকিলপট্টীর বাড়িতে আসতেন তখন অনেক মেয়েদের রবীন্দ্রসংগীতের প্রশিক্ষণ দিতেন। দীননাথ দাসের কন্যা অমিয়া দাস ও সুশীলা দাস কলকাতার কলেজে পড়াকালীন ছুটিতে আসলে মেয়েদের রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন। সে যুগে মাতঙ্গিনী ভট্টাচার্য্য, বিজয়া চৌধুরী, অমিয়া দাস, সুশীলা দাস, শীলা মিত্র যুথিকা দত্ত, কামাক্ষাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন।

হেমচন্দ্র দত্তের কন্যা যুথিকা দত্ত শান্তিনিকেতনে এমএ ক্লাসের ছাত্রী থাকাকালীন লোকান্তরিত হন ১৯১৮ সালে। রবীন্দ্রনাথ শোক প্রকাশ করে এই কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন।

Uttarayan
Santiniketan, Bengal
যুথিকা,
এসেছিলে জীবনের আনন্দ দূতিকা,
সহসা তোমারে সবে করিল হরণ
নির্মম মরণ
পারেনি করিতে তবু চুরি
তরুণ প্রাণের তব করুণ মাধুরী,
আজো রেখে গেছে তার চরম সৌরভ
চিত্তলোক স্মৃতির গৌরব।
২৪ পৌষ, ১৩৪৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কবিতা রবীন্দ্ররচনাবলীতে আজো সংকলিত হয় নি। যুথিকা দত্ত শান্তিনিকেতনে প্রথম ছাত্রী শিলচর থেকে। রবীন্দ্রসংগীতে দক্ষতা ছিল। পুরানো দিনের সংগীত শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখনীয় ফুল্লরাণী চৌধুরী, মায়া মজুমদার, মিলন মজুমদার, অঞ্জলি সেন, প্রীতি দত্ত, অভ্ররেণু দাস, বাণী নন্দী, বেলা নন্দী, টগরকনা ধর

ভৌমিক, পরিমল দাস, সুজলা দাস, নীলমাধব সিংহ, দীপক বিশ্বাস, হারাণ সেনগুপ্ত, আনন্দময়ী ভট্টাচার্য্য, মালবিকা দাস, চিত্রলেখা ভৌমিক, প্রীতিলতা নন্দী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য।

১৯৪০ সালে এখানে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমান্বয়ে নৃত্যেও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রিকি, সংগীত ভারতী, নৃত্যায়ন, সৃষ্টি মণিপুরি কলা একাডেমি ও আরো অনেক সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে রবীন্দ্রচর্চাকে অব্যাহত রেখেছেন ক্রম না রেখে তাঁদের নাম উল্লেখ করছি, এরা হলেন আনন্দময়ী ভট্টাচার্য্য, পাঞ্চালী ধর, মৈত্রেয়ী দাম, শিবানী ব্রহ্মচারী, ফাল্গুনী দে, সুরঞ্জনা পুরকায়স্থ, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, পঙ্কজ নাথ, বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, অপু সূত্রধর, জয়দীপ মোহন্ত, প্রিয়তোষ রায় চৌধুরী আরো অনেক নবীন শিল্পীরা। শুভপ্রসাদ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী। পরিমল দে (দাস) রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রূপে আজও স্বনামখ্যাত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৫৬ সালে শিলচরে থাকাকালীন তাঁর স্থাপিত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

ত্রিশের দশক থেকে শিলচরে আবৃত্তি চর্চার পরীমণ্ডল গড়ে উঠে। প্রণতি দাস, সুদীপ শ্যাম, বিজয় ভট্টাচার্য্য, সাগরিকা শ্যাম, নন্দিতা সোম, সুনীলকুমার দে, গোপা দত্ত রবীন্দ্রজন্মোৎসব ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতেন। প্রণতি দাস ও সুদীপ শ্যাম বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে আবৃত্তি করেছেন। বর্তমানে অমিত সিকিদার, মনোজ দেব, অনির্বাণজ্যোতি গুপ্ত, স্বরূপা ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রিমা শ্যাম বচিক শিল্পকে চর্চার মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছেন। ১৯৩১ সালে শিলচরের তরুণরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার উদ্দেশ্যে 'তরুণ রস চক্র' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। নামকরণ করেছিলেন নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম। অমরেশ দত্ত ছিলেন সভাপতি। 'দিগন্ত' পত্রিকা ছিল তাঁদের মুখপত্র, সম্পাদক পরিমল পুরকায়স্থ। বিরিঞ্চ দেব, জ্যোৎস্ময় দত্ত রায়, অনাদি চক্রবর্ত্তী, নিরুপম শ্যাম, পরিমল মুখার্জি, বিজয় ভট্টাচার্য্য, অজিত বক্সী, অরবিন্দ মোহন গুপ্ত, কিষণ পাটোয়া, ডা. বিজয় দেব ছিলেন সদস্য। প্রতিবছর তাঁরা রবীন্দ্রজয়ন্তী ও বসন্ত উৎসব করতেন। শিলচরের রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটক উপস্থাপন করেছেন। ১৯৩১* সালে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি (সভাপতি) সুভাষচন্দ্রকে শিলচর পৌরসভার পক্ষ থেকে মিউনিসিপ্যালিটি মাঠে (বর্তমানে যেখানে জলপ্রকল্প) নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। এই সভায় তরুণ রসচক্রের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হয়। কবিতায় লেখা মানপত্র রচনা করেছিলেন অমরেশ দত্ত। মানপত্র গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন — 'তোমরাতো দেখছি তরুণ রসঘন চক্র'।

১৯৪৫ সালে 'তরুণ রসচক্র' রুম-নং ৯ নাটক করে প্রবেশ পত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ ২০০ টাকা নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে পাঠিয়েছিল।

'ভবিষ্যৎ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর তরুণ কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কোনো পত্রিকা ছিল না। নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম ত্রিশের দশকে 'সুরমা' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তরুণদের সাহিত্য চর্চার জন্য পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। সুধীর সেন, রামেন্দ্র দেশমুখ প্রমুখ তরুণ লেখকদের সাহিত্য চর্চার ছিল একমাত্র মাধ্যম।

১৩৫৭ সালে (১৯৫০) নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের উদ্যোগে ও সতীন্দ্রমোহন দেবের সহায়তায় ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় অরুণচন্দ্র গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র প্রকোষ্ঠ (রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চাকেন্দ্র) উদ্বোধন করেন অশোকবিজয় রাহা। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আসর বসতো। এই প্রকোষ্ঠ আজ আর নেই। ১৯৫৬ সালে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ও রুক্মিণীকুমার দাসের সহযোগিতায় ব্রাহ্মমন্দির, রবিসংস্কৃতি সংস্থা গড়ে উঠে। প্রতি সপ্তাহে একদিন আলোচনা

---

* ইতিমধ্যে দেবাশিস দাস লিখেছেন 'তরুণ রসচক্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪০ সালে।

সভা বসতো। পঞ্চাশের দশকে দেবেন্দ্র পাল চৌধুরীর উদ্যোগে সাহিত্যচক্র স্থাপিত হয়েছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অরুণচন্দ্র গ্রন্থাগারের পাঠাগার কক্ষে আলোচনা সভা বসতো। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও তরুণ কবি ও সাহিত্যিকরা যোগদান করতেন।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ২৪শে বৈশাখ থেকে ৩১শে বৈশাখ আটদিনব্যাপী কেন্দ্রীয় গ্রন্থভবনে উদযাপিত হয়েছিল। ভারতের তৎকালীন সমস্ত প্রদেশে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নির্দেশ এসেছিল ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে রবীন্দ্রভবন স্থাপিত হয়। শিলচরে জেলা অধিকর্তা বিমলানন্দ দোয়ারা সভাপতি, নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম সাধারণ সম্পাদক, অমিত সরকারকে সহ-সম্পাদক ও রবীন্দ্র অনুরাগী ও বিশিষ্ট জনদের নিয়ে কেন্দ্রীয় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

প্রতিদিন ভোর, প্রাতঃ অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হত কেন্দ্রীয় গ্রন্থভবনে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড° শশীভূষণ দাস গুপ্ত আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। নিবন্ধের কলেবর সীমিত রাখার জন্য শুধুমাত্র প্রথমদিনের অনুষ্ঠান সূচি উল্লেখ করছি—

২৪শে বৈশাখ, ১৩৬৮
ভোর ৪-৩০ মি: প্রভাতী : রবীন্দ্রসংগীত গাহিয়া নগর পরিক্রমা।
প্রাত : ৭ ঘটিকা হইতে : কেন্দ্রীয় গ্রন্থ-ভবনে-বোধানুষ্ঠান:
পুরোধা : শ্রী রসময় কাব্যতীর্থ।
মাঙ্গলিকী ও সঙ্গীতাঞ্জলী : শিল্পী - শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী দীপক বিশ্বাস, শ্রী অমিত সরকার, শ্রী হারাণ সেনগুপ্ত, শ্রী শ্যামপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রী মতিলাল সিংহ, শ্রী অশ্বিনীকুমার দে, শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
প্রার্থনা : বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য।
অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে : সাহিত্য বাসর : পুরোধা ডা: শশীভূষণ দাসগুপ্ত।
রবীন্দ্রসঙ্গীত : শ্রীমতী মালবিকা দাস, শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দত্ত।
সভাপতি বরণ : শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম।
অভ্যর্থনা : শ্রী বিমালন্দ দোয়ারা।
সভাপতির ভাষণ : ডা: শশীভূষণ দাসগুপ্ত।
রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা : শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম- 'রবীন্দ্রকাব্যের ভাবকল্প ও রসকল্প', শ্রী জালাল উদ্দিন আহমদ বড়লস্কর, 'ইসলামিক সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ'
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দত্ত : 'মার্গ সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত'
উদাহরণ সহযোগে প্রতীতি সঞ্চয়।
সভাপতি মন্তব্য :
রবীন্দ্রসঙ্গীত : শ্রীমতী চিত্রলেখা ভৌমিক।
সন্ধ্যা ৬-৩০ : যন্ত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর : শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অশ্বিনীকুমার দে।
কবি প্রণাম : শিবানী চক্রবর্ত্তী।
'কর্ণকুন্তী সংবাদ' : সূচনা-শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম।
রূপায়নে - শ্রী ক্ষীরোদশশী দে ও শ্রীমতী তারামণি দত্ত।
'ঋতুরঙ্গ' : নৃত্যানুষ্ঠান - রূপায়নে অরুণ-পথিক দল।
'মুক্তধারা' : নাটিকাভিনয়-মধ্যসহর সাংস্কৃতিক সমিতি।

আমার পিতৃদেব সেই সময় কাছাড়ের প্রত্যন্ত গ্রামে নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে। কোনো এক গ্রামে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কৃষিকথা, গ্রামীণ সমবায় ও 'হল কর্ষণ' উৎসব প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভা শেষে ফিরে আসার পথে হঠাৎ একজন কৃষক জিজ্ঞেস করলে, — আপনি যাঁর কথা এতক্ষণ ধরে বললেন তিনি কি খুব বড় কৃষক ছিলেন? পিতৃদেব বিষয়টি তাঁর মত করে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।

কামিনীকুমার চন্দের সাথে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অপূর্বকুমার চন্দ শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন। বিদেশ ভ্রমণে অনেকবার রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র অনিলকুমার চন্দ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। কামিনীকুমার চন্দ রেলওয়ের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই সময় প্রায়ই তাঁকে রেলে যাতায়াত করতে হত। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে 'রেলচরে' বলতেন।

শশীন্দ্র সিংহের স্ত্রী কুমুদিনী সিংহ ১৯২০ সালে শিলচরের মিশন স্কুল থেকে গুরু ট্রেনিং পাশ করে শান্তিনিকেতনে শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক আনন্দ ঘোষ দস্তিদার ও মণিপুরি নৃত্য শিক্ষক রাজকুমার সেনারিক দীর্ঘদিন রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ছিলেন। ১৩৩৫ বাংলার (১৯২৮) 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লিরিকধর্মী উপন্যাস 'শেষের কবিতা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে অমিতের ভাবনায়, 'তাই ও যখন ভাবছে, পলাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, এইবার ঘনবর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কুলছাড়া করবে।" ১৯৩৯ সালে সাপ্তাহিক 'সপ্তক' পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন- 'সাতবর্ণ মিলে যথা দেখা দেয় এক শুভ্রজ্যোতি সব বর্ণ মিলে হোক ভারতের শক্তির সংহতি।'

ছোটদের একটি ছড়ায় রয়েছে—

শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হোস্টেলে যত ছাত্র....

১৯৪০ সালে জ্যোৎস্না চন্দ সম্পাদিত শিলচরের প্রথম মহিলা পত্রিকা 'বিজয়িনী'তে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন —

হে বিধাতা,
রেখোনা আমারে বাক্যহীনা
রক্তে মোর বাজে রুদ্র বীণা।।

কিন্তু এই দুটি কলি ১৩৩৫ সালে (১৯২৮ ইং) 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থে 'সবলা' কবিতায় রয়েছে

হে বিধাতা,
আমারে রেখোনা বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।।

এই দুটি পংক্তি 'সবলা' কবিতার পাঠান্তর বলা যেতে পারে।

১৩৯৪ সালে (১৯৮৭) সুধীর সেনের অনুপ্রেরণায় ও অংশুমান ভট্টাচার্যের উদ্যোগে আমরা বাড়িতে 'রবীন্দ্র পরিক্রমা' নামে রবীন্দ্র চর্চা ও অনুশীলনের বৈঠক করতাম। ১৯৯৪ সালের ২৫ বৈশাখ প্রথম বৈঠক হয়েছিল। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার সন্ধ্যায় আসর বসত। বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে রবীন্দ্রনাথ

সম্পর্কে অবহিত করাই ছিল এই আসরের প্রধান উদ্দেশ্য। ২৫ বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণের উদযাপনের দিন হাতে লেখা মুখপত্র 'রবীন্দ্র পরিক্রমা' সুধীর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রবীণ নবীন ও শিশুদের লেখাও চিত্রাঙ্কন থাকতো। পরিতোষ দাসগুপ্ত, সুখময় ভট্টাচার্য, বিশ্বতোষ চৌধুরী এরা যোগদান করতেন। প্রায় চার বছর এই বৈঠক চলছিল। আজও আমরা ঘরোয়া পরিসরে ২৫ বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণ উদযাপন করি।

রবীন্দ্রসাহিত্য ও অনুশীলন চর্চাও অনুষ্ঠান ও তার প্রচার ও প্রসারে এই প্রান্তিক শহর শিলচরে যাঁরা নিরলস প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন এবং তাঁদের বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার প্রয়াসে আজ শিলচর তথা বরাক উপত্যকা রবীন্দ্রসাহিত্য সাধনা ও বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক তীর্থস্থানে পরিণত।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২. নারীকল্যাণ সমিতির (AIWC শাখা) কার্যবিবরণী

৩. বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র, বিজ্ঞপ্তি চিঠিপত্র ইত্যাদি

৪. তরুণ রসচক্র, অনাদি চক্রবর্তী, বরাক শারদীয় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

# করিমগঞ্জে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী : একটি প্রতিবেদন

## অরিজিৎ চৌধুরী

পঞ্চাশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে করিমগঞ্জে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। তখন করিমগঞ্জের জনজীবনে বহুসংখ্যক প্রকৃত সংস্কৃতিপ্রেমী, শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব সক্রিয় ছিলেন এবং সমাজে এঁদের যথাসাধ্য সম্মান ছিল।

পরিবেশ তখন আজকের মতো ছিল না। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য করিমগঞ্জের নাগরিকদের এক সভায় মহকুমা শাসক প্রফুল্লচন্দ্র দেবকে সভাপতি, করিমগঞ্জ কলেজের উপাধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও ভূবসন আধিকারিক রামানন্দ বরুয়াকে সহ-সভাপতি, করিমগঞ্জ কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সুখময় বসুকে সাধারণ সম্পাদক এবং ম্যাজিস্ট্রেট তথা ট্রেজারি অফিসার অজয়কুমার দাসকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে একটি রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সমিতি গঠন করা হয়। করিমগঞ্জের আরও অনেক বিশিষ্ট নাগরিককে এই সমিতিতে সভ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে একটি আবেদন প্রচার করেন। এতে বলা হয় যে শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি বিশদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ছাড়াও পাঁচটি স্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এগুলি হচ্ছে— ১) শহরের কোনও উপযুক্ত স্থানে কবিগুরুর একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা; ২) মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতি বৎসর রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা; ৩) রবীন্দ্র সাহিত্য অধ্যয়ন ও গবেষণার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মুদ্রিত রচনা এবং রবীন্দ্র-জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কিত এ যাবৎ প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; ৪) প্রধানত স্থানীয় লেখকদের লেখা-সম্বলিত একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ এবং ৫) একটি 'রবীন্দ্র-সদন' প্রতিষ্ঠা। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক যুগশক্তি পত্রিকার ১৩ জানুয়ারি (১৯৬১) সংখ্যার এই আবেদন মুদ্রিত হয়। এই রবীন্দ্রসদনই হচ্ছে করিমগঞ্জের বর্তমান মহিলা মহাবিদ্যালয়।

১৯৬১ সালের ২৯ জানুয়ারি ছাত্র সংহতির উদ্যোগে করিমগঞ্জের রসরাজ মেমোরিয়াল হলে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক ছাত্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট কবি সুধীর সেন এতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জননেতা ও সাংবাদিক মোহিতমোহন দাস, সুজিৎ চৌধুরী, দেবপদ চৌধুরী, সতু রায়, ভোলানাথ চক্রবর্তী, অসীম সেন প্রমুখ।

১৫ এপ্রিল জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সমিতির এক সভায় কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ওইদিন সভায় জানানো হয় যে করিমগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তুলারাম ভূরা প্রত্যেক বছর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনার

জন্য ১০০ টাকার 'ভূরা পুরস্কার' দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৫০০ টাকা দান করেছেন।

ইতিমধ্যে ভাষা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র করিমগঞ্জ সহ সমগ্র অবিভক্ত কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনের তুমুল প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সমগ্র কাছাড়ব্যাপী করা হচ্ছে পদযাত্রা এবং দেখা দিয়েছে অপূর্ব জাগরণ। বাংলা ভাষাকেও অন্যতম রাজ্যভাষা করা, অন্যান্য অনঅসমিয়া ভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দান এবং জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার রক্ষার দাবিতে পরিচালিত পদযাত্রা যে পরিবেশের সৃষ্টি করে, তা সবাইকে পরাধীন যুগের স্বদেশি আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গেয়ে গেয়েই পদযাত্রী দল অবিভক্ত কাছাড়ের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করছিল।

স্মর্তব্য যে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতির নিদারুণ ব্যবস্থার মধ্যেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের কাজকর্ম ক্রমে কিন্তু কোনও শৈথিল্য আসেনি, যদিও আন্দোলনকারী নেতা ও কর্মীদের বেশির ভাগই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

পঁচিশে বৈশাখের (৮ মে) পুণ্যপ্রভাতে করিমগঞ্জ শহরের শম্ভুসাগরের পূর্বতীরে নবনির্মিত মর্মর বেদীর উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী। মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত শিল্পী কার্তিকচন্দ্র পাল। শতশঙ্খ ধ্বনিমুখরিত এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে অধ্যাপক চক্রবর্তী এই রবীন্দ্র মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি তাঁর সারগর্ভ ভাষণে বলেন কবিগুরুর তপস্যা, আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে পারলেই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে। মালা ও পুষ্পস্তবক অর্পণের কার্যক্রমের পর সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত রবীন্দ্রবন্দনা পাঠ করেন করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হারানচন্দ্র ভট্টাচার্য। এরপর সকাল সাড়ে ন'টায় মদনমোহন মাধবচরণ বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন একটি জমিতে রবীন্দ্রসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শতবর্ষ উদযাপন সমিতির সভাপতি তথা মহকুমা শাসক প্রফুল্লচন্দ্র দেব (পরে অবশ্য রবীন্দ্রসদন কলেজের স্থান পরিবর্তন করা হয়)।

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় সরকারি হাইস্কুলের খেলার মাঠে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নির্মিত বিরাট মণ্ডপে উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। যুগশক্তি পত্রিকার ১২ মে (১৯৬১) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মণ্ডপের প্রবেশদ্বারে এক মনোরম তোরণ নির্মাণ করে তার দুই পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ ও ষোড়শমঙ্গল চিহ্ন রক্ষিত ছিল। মণ্ডপের অভ্যন্তরে মঞ্চের সামনে ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবিজননী সারদা দেবী, কিশোর রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশি যুগের রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর বৃহদাকারের চিত্র। এগুলি এঁকেছিলেন করিমগঞ্জের সুদক্ষ শিল্পী শচীন দে। মঞ্চের উপর গুরুদেবের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব আলেখ্যও রাখা হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বস্তিবচন পাঠ করে ভাষণ দেন করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমন্ত্রিত অতিথি অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এরপর অভিনীত হয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। মাঠে ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষের সমাগম হয়েছিল।

পঁচিশে বৈশাখ সন্ধ্যায় শহরের বাড়ি বাড়ি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। পৌর কর্তৃপক্ষ রাজপথেও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তার পরদিন অর্থাৎ ছাব্বিশে বৈশাখ (৯ মে) করিমগঞ্জের উপর দিয়ে এক বিধ্বংসী ঝড় বয়ে যায়। সেই ঝড়ে সরকারি স্কুলের খেলার মাঠে যে বিরাট মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল, সেটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ওইদিনের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে হয়। সকালে শুধু আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (ক বিভাগ) হয়েছিল। পরদিন অর্থাৎ সাতাশে বৈশাখ (১০ মে) থেকে অনুষ্ঠানস্থল রমণীমোহন ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত হয়।

সাতাশে বৈশাখ সকালে 'খ' বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে শিলচরের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও আইনজীবী নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে এক মনোজ ভাষণ দেন।

ওইদিন কলকাতার খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সমরেশ চৌধুরীর করিমগঞ্জে এসে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন বিমান অবতরণ না করায় তিনি আসতে পারেননি। পরে 'শ্যামা' নৃত্যানাট্যটি মঞ্চস্থ হয়।

আটাশে বৈশাখ (১১ মে) সমরেশ চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ওইদিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিলচরের শিক্ষাবিদ ও কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী'— বিষয়ক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ, 'খ' বিভাগের সংগীত প্রতিযোগিতা ও নাটক (শেষরক্ষা)।

উনত্রিশে বৈশাখ (১২ মে) সমরেশ চৌধুরী এবং দুই স্থানীয় শিল্পী মীরা দাস (পরবর্ত্তীকালে আচার্য) ও চন্দনা দাশগুপ্ত (পরবর্ত্তীকালে সেনগুপ্ত) রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে 'ক' বিভাগের সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিকেলে ও সন্ধ্যায় ছিল স্থানীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী হরিদাস ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীতের ধারা'— বিষয়ক ভাষণ, নৃত্যানাট্য 'চণ্ডালিকা' ও নাটক 'মুকুট'।

তিরিশে বৈশাখ (১৩ মে) সকালে 'গ' বিভাগের সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে ডিব্রুগড়ের কনৈ কলেজের অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী যোগীরাজ বসু রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। এরপর অভিনীত হয় নাটক 'চিরকুমার সভা'।

একত্রিশে বৈশাখ (১৪ মে) সকালে অনুষ্ঠিত হয় 'গ' বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। বিকেলে ছিল যোগীরাজ বসুর দ্বিতীয় ভাষণ। ভাষণের পর অভিনীত হয় 'মুক্তির উপায়'। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় সংগীতালক্ষ্য 'ঋতুরঙ্গ'।

পয়লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে) রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে ভাষণ দেন হাইলাকান্দি কলেজের অধ্যক্ষ দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরে রামকৃষ্ণনগরের শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন নৃত্যানাট্য 'শ্যামা'।

দোসরা জ্যৈষ্ঠ (১৬ মে) সকালে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা। এতে বিভিন্ন শিল্পী ধামার, ধ্রুপদ, কীর্তন, বাউল, উচ্চাঙ্গ, লঘু প্রভৃতি নানা ধাঁচের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। নয় দিন ব্যাপী প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসবের শেষে উদযাপন সমিতির সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র দেব এই উৎসবের আয়োজনে প্রদত্ত সাহায্য-সহানুভূতির জন্য সর্বসাধারণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, এই শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সংগীত শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, আবৃত্তিকার এবং অন্যান্যরা যে নৈপুণ্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সবার অকৃত্রিম প্রশংসা অর্জন করে।

করিমগঞ্জ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে জুন মাসে 'রবি-প্রকাশ' নামে একটি

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৩০ জুনের (১৯৬১) যুগশক্তিতে সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক সুখময় বসু এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এই স্মারকগ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য আবেদন জানান, দাম ছিল দু টাকা, সডাক দু টাকা আশি পয়সা।

করিমগঞ্জে দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয় ১৯৬১ সালের ১৮ নভেম্বর। করিমগঞ্জ কলেজ হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন উপাধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, হরিদাস ঘোষের উদ্বোধনী সংগীতের পর সুখময় বসু সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপিকা রেবা দেব রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতা আবৃত্তি করেন এবং অক্ষৌহিণী রায়, অরুণকান্তি শ্যাম ও চন্দনা দাশগুপ্ত কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন সুধীর সেন। অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ দাস ও দীপক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উপর আলোকপাত করে বক্তৃতা দেন। সভাপতির ভাষণ ও সমাপ্তি সংগীতের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

***(তথ্যসূত্র — করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক যুগশক্তি পত্রিকার ১৯৬১ সালের ফাইল)***

# গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী : প্রতিবেদন ১

## দীপংকর চন্দ

সদ্য পাঁচ পেরোনো এক বালকের স্মৃতিতে কিছু বিচ্ছিন্ন ছবির কোলাজে আজও জাগরুক পঁচিশে বৈশাখ ১৯৬১— কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী। আজ, মধ্য পঞ্চাশে, বুকের অ্যালবাম থেকে সেইসব অস্পষ্ট ছবিগুলিকে সাজাতে ইচ্ছে করছে— প্রায় 'পূর্বজন্মের' স্মৃতিকথা হাতড়ানোর সামিল এই প্রয়াস।

**দৃশ্য এক—**

উধারবন্দ পোস্টঅফিসের কর্মী প্রয়াত নৃপেন্দ্রকুমার দেব মহাশয়ের বিরাট উঠানে রিহার্সেল চলছে, হ্যারিকেনের আলো। ডঃ ঘোষালের মেয়ে মন্টু (কবিতা ঘোষাল) মাসি ও ঋষিকেশ ধর, মাতৃদেবী হেনা চন্দের তত্ত্বাবধানে তুলে নিচ্ছেন দ্বৈত সংগীত 'তোমার বাস কোথা যে পথিক, ওগো দেশে কি বিদেশে'— পাশে তবলায় নিকুঞ্জ মামা। একটু দূরে আরেকটা সতরঞ্চির উপর যারা বসে— তাদের কজন থেকে থেকে একটাই কবিতা পড়ে যাচ্ছেন আর বাকিরা সেই আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ছোঁড়ে শরীর বাঁকিয়ে একটা কিছু প্র্যাকটিশ করে যাচ্ছেন— ঐ তো ছবিমামা, সুশীলমামা, লম্বাটে রঙ্গময়মামা— একপাশে চেয়ারে বসে বাবা মাঝেমাঝে কি বলছেন ওদের— আবার ঐ আবৃত্তি, আবার সেই হাত পা ছোঁড়ে কিছু একটা করছে— ওদের কারো কোনো কথা নেই মুখে। দেখতে দেখতে ঘোর লেগে যেত— অমলদা নির্মলদাদের বাড়ির পেছনের সুপারি গাছগুলি ক্রমশ বড় হতে হতে ছুঁয়ে ফেলে তারাভরা আকাশ— ঘুমপরীরাও ওখান থেকে নেমে আসে— তাদের 'হয়তো চিনি হয়তো চিনি হয়তো চিনিনে।'

**দৃশ্য দুই—**

পঁচিশে বৈশাখ, সন্ধ্যার অনুষ্ঠান, গরম উপেক্ষা করেও উপস্থিত বহুজন। ডি এন হাইস্কুলের (এখন যেখানে বায়োলজি প্র্যাক্টিক্যাল রুম) একদিকে উঁচু প্ল্যাটফরম বেঁধে অনুষ্ঠান। স্টেজের একেবারে সামনে সাদা পর্দা, পেছন থেকে ফেলা আলো শরীরে ধরে সৃষ্টি হল ছায়ানাট্য— ঐ যে রাখাল, দৌড়ে এলেন মাসি, নৌকার গলুই-এ বসে মোক্ষদা, ঐ তো মিত্র মহাশয়— মাঝি মল্লা— পালতোলা নৌকা— কানে আসছে মা-র গলায় 'দেবতার গ্রাস'— কথা আর ছবি এমন মেলামেশা। চোখে ভাসে রাখালকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার দৃশ্য— তারপর দেখি 'ব্রাহ্মণ ঝাঁপ দিলা জলে'— অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের নীরব আর্তনাদ— নদীর ঢেউ-এ বেসামাল নৌকা— 'সূর্য গেল অস্তাচলে'— একটা লাল আলোকবিন্দু ধীরে ধীরে ডুবে গেল সাগরজলে।

**দৃশ্য তিন—**

বড়ই বেমানান সেটা। অনুষ্ঠান শেষ— কুশীলবেরা গুছিয়ে নিচ্ছেন জিনিসপত্র, আমরা ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষারত। হঠাৎ দেখি ডি এন স্কুলে তদানিন্তন অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার ও প্রতিবেদকের পিতৃদেব— খুবই উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছেন— কিছু বলছেন— বুঝিনি— কেবল একটা ছোট্ট, সম্পূর্ণ, প্রশ্নবোধক

বাক্য আজও কানে জেগে আছে— 'কিতা করত পারল বিভাস রায়?' (ছদ্মনামই দিলাম একটা)— কিন্তু কেন, কী হয়েছিল, কেন ঐ মন্তব্য— কিছুই বুঝিনি সেদিন, আজও না। মা বাবার তত্ত্বাবধানে, যুবসমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপন কী করে প্রতিবাদযোগ্য হয়ে ওঠে কারও কাছে? একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিপক্ষে কিছু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কী ছিল? কেন হবে— কী করে হয়— ভাবতে ভাবতে কেটে গেল পঞ্চাশ বছর। কিন্তু উত্তেজিত মানুষটির পায়চারী এবং ঐ মন্তব্য— কোনোটাই তো অসত্য নয়।

মুশকিল হলো— ঐ উদ্যোগী যুববৃন্দের বেশির ভাগই প্রয়াত— সুশীল দেব, ঋষিকেশ ধর, নিকুঞ্জ সিংহ, কানাইলাল পোদ্দার, নির্মল দেব, অরুন্ধতী চন্দ, হেনা চন্দ, শান্তিরঞ্জন চন্দ, প্রভাদিদি, নৃপেন্দ্র দেব— সবাই। বাবুলমামা মন্টুমাসিরা কলকাতায়, যোগাযোগবিহীন। রঙ্গময়মামা আছেন কিন্তু মানুষটা এরকম— নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে অন্য কোনদিকে কান দিতেন কম। ছবিমামা শিলং ছেড়ে এখন আমেরিকা। একটা পরিস্থিতির উত্তর জেনে বসে আছি প্রশ্নটা (বা প্রশ্নগুলি) এখনও অজানা।

রবীন্দ্র শতবর্ষে, শহর শিলচর ছাড়িয়ে গ্রাম বা মফঃস্বল কাছাড়ে কোথায় কী হয়েছিল জানি না, হলেও সেই এলাকার কতজন শামিল হয়েছিলেন বুঝেগুনে— জানি না তেমনভাবে। তবে এটা দেখেছি, বুঝেছি যে ডি এন স্কুল কেন্দ্রিক যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন শুরু শতবর্ষ থেকে— তার মান, অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য, অংশগ্রহণের বিশালতা— চিরভাস্বর এককথায়। সেই ১৯৬১-তেই 'শ্যাডো ড্রামা' পুরুষ-মহিলাকণ্ঠে দ্বৈতকণ্ঠে— কাব্যকাহিনীর নাট্যরূপ— অকল্পনীয় সেই ধারাপাত। জানতে ইচ্ছা করে এই শহরেরই কত বাড়িতে ছিল রবীন্দ্র রচনাবলী? নিদেন পক্ষে সঞ্চয়িতা? বা গীতবিতান? নির্দিষ্টভাবে বলা যায়— কতটা প্রসার-প্রচার ছিল রবীন্দ্রসংগীতের? তার সূচনা তো ঐ শতবর্ষ পর-ই। সেই সুধারসের ঢেউ বরাকে (তখনকার কাছাড়ে) এসে পৌঁছনোর আগেই রচিত হয়ে গেল এক রক্তাক্ত অধ্যায়— এ অঞ্চলে তখন আর কোথায় সেই সাংস্কৃতিক মেজাজ! শহিদ-শোকে নিমজ্জ বরাক তখন বাঁচার অক্সিজেন খুঁজছে।

মনে রাখা আবশ্যক, রবীন্দ্র-আলোচনা ছিল ঐ অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান সূচি। আলোচক কারা? নামগুলি উচ্চারণ করি আরেকবার— চিরস্মরণীয় দেবব্রত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী, অংশুমান ভট্টাচার্য, জগন্নাথ রায় চৌধুরী, জগত লাহা, কেশব চক্রবর্তী, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ ভট্টাচার্য তাঁর মেয়েও সঙ্গে— কে আসেননি ডি এন উধারবন্দে বিভিন্ন বর্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে? বহুকাল সমানে চলছে বিশ্বকবিকে কেন্দ্র রেখে সাংস্কৃতিক পরিধি বিস্তার এবং তার শুরু সেই জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান।

তবু-ও সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এই প্রাণময় অভিজ্ঞতার আকাশের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ একান্ত ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা— কারা এবং কেন বাধা দিয়েছিল কবিগুরুর শতবর্ষ পালনে? ভাবনার জগতে নূতন-পুরাতনের সংঘাত? উদ্যোগী যুব-সমাজ পাশে এসে দাঁড়ানোয় গোপন-হিংসা? আবার মনে হয় ঐ বিরোধীতাই হয়ত জাগিয়েছিল negative-impulse! অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলোক উৎসরণের ছবিটির পাশে একজন ব্যক্তিমানুষের ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর ছবি অমলিন গেঁথে আছে হৃদয়নন্দন বনে। আজীবন।

# গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী : প্রতিবেদন ২

## সঞ্জীব দেবলস্কর

একষট্টির বার্তা সেদিনের বরাক উপত্যকার যে সব গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে গিয়েছিল জাটিঙ্গার তীরে বড়খলা গ্রামটি এর অন্যতম। সেদিন স্থানীয় রাজা গোবিন্দ চন্দ্র মেমোরিয়েল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল ওই অঞ্চলের বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। স্কুলে ছিলেন একঝাঁক তরুণ শিক্ষক এবং জ্ঞানতাপস বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরাও। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, জগদীন্দ্র নারায়ণ দেবলস্কর, কেতকী সিকিদার, উমাশঙ্কর দাস, বিধান লালা, পূর্ণেন্দু বর্মন, নবেন্দু দাস; ছিলেন পদ্মলোচন নাথ এবং পণ্ডিতমশাই সুনীতি গোস্বামী। গৌহাটি কটন কলেজ শেষ করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিয়ে অস্থায়ী ভাবে যোগ দিলেন জলদবরণ দেবলস্কর, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী অন্যতম উদ্যোক্তা। গৌহাটি ও কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রসংগীতের সম্ভার, রবীন্দ্র নাটক, গীতিনাটক প্রযোজনার অভিজ্ঞতা এবং সঙ্গে তখন পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্র স্ববিতানের হলদে রঙের খণ্ডগুলো। তাঁকে সম্পাদক এবং কেতকী সিকিদারকে সভাপতি করে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপন সমিতি গঠিত হল। সারা দেশের সঙ্গে গ্রামকাছাড়ের এ প্রত্যন্ত প্রদেশে শোনা গেল স্কুলের ছেলেমেয়ের, শিক্ষকদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র নাটকের সংলাপ। প্রাত্যহিক অনুশীলনী চলল মাসখানেক ধরে। 'হে নতুন', 'অরূপ তোমার বাণী', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'-এ গানগুলো শুনতে শুনতে একটা নতুন প্রজন্ম তৈরি হল জন্মের প্রথম শুভক্ষণ, সেই পঁচিশে বৈশাখ দিনটির জন্য। ওই পঁচিশে বৈশাখের মাধ্যমেই স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামকাছাড় সাংস্কৃতিক আধুনিকতার দিকে দিল একটি বড় পদক্ষেপ। সেদিনের উদ্যোক্তা বা অংশগ্রহণকারীরা হয়তো ভাবেননি এ জন্মশতবার্ষিকী সারা দেশের সঙ্গে তাঁদের জীবনেও এক নতুন যুগের বাণী নিয়ে আসছে।

গ্রামবাসীদের থেকে চাঁদা সংগৃহীত হল, নদীর ওপারে বিজয়পুর, রামপুর, বালাছড়া, ডলু প্রভৃতি চা বাগানের কর্মচারীরা, আধিকারিকেরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। ওদের অনেকেই সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, ওদের ছেলেমেয়েরা বড়খলা স্কুলে পড়াশোনা করত। ২৫ বৈশাখ দিনটিতে রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাই স্কুলে হল ঘরে আয়োজিত হয় জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন যতীন্দ্রমোহন দেবলস্কর, এবং রামপুর বাগানের যতীন্দ্র পাল চৌধুরী। তাছাড়াও অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল ডলু এম ই স্কুল প্রধান শিক্ষক শ্রীরাম চক্রবর্তী, বড়খলার সুখেন্দু ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন হরিময় ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজয় দেবলস্কর। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল দাস চিকিৎসার জন্য বাইরে ছিলেন, তাই সহকারী প্রধান দিগম্বর বর্মনই সভাপতিত্ব করেন।

শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের পরবর্তীতে ছিল রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র আবৃত্তি, ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। সেদিনের পরিবেশিত সব কটি গান এর কথা উল্লেখ করা গেল না, তবে ছাত্র ছাত্রীরা 'হৃদয় আমার নাচের আজিক্যে ময়ূরের মতো নাচে রে', 'সহসা ডালপালা তোর উতলা যে', আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

আমরা', এ গানগুলো গেয়েছিল। কেতকীরঞ্জন সিকদার এবং জলদবরণ দেবলস্কর গেয়েছিলেন, 'অরূপ তোমার বাণী'। অনুষ্ঠানে নবগোপাল বর্মন এবং জলদবরণ দেবলস্করও একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। সমবেত কণ্ঠে 'হে নতুন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ', 'ওই মহামানব আসে', 'হে ভৈরব শক্তি দাও', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানগুলো পরিবেশিত হয়। তাছাড় রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতা অবলম্বনে একটি ব্যালেও পরিবেশিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শতবার্ষিকীর ওই অনুষ্ঠানকে মনে রেখে সেদিনের ছাত্র ভাস্কর প্রতিম দেব মাটি দিয়ে একটি রবীন্দ্র মুখাবয়ব নির্মাণ করেন এবং এ অবয়বে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের মাধ্যমেই অনুষ্ঠান এর সূচনা হয়। সেদিনের সব শেষ নিবেদন ছিল কবিগুরুর নাটক 'বিসর্জন' মঞ্চায়ন। কেতকী সিকিদার করেছিলেন রঘুপতি এবং জলদবরণ করেছিলেন জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয়। এ নাটক রূপায়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন কল্যাণ দত্ত। আজ এতদিন পর সব খবর সংগ্রহ করা গেল না। তবু কবিগুরুর সার্ধশত জন্মজয়ন্তীতে সেদিনের ওই সব কলাকুশলীদের কথা এখানে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক, কারণ বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক জীবনে সেদিনের ওই আয়োজন, তা সে যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন এর প্রভাব অদ্যাবধি ক্রিয়াশীল। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে এদের কথা অনুচ্চারিত থাকলে তা হবে অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। সেদিন ওরা যা করেছেন, কালের বিচারে তার গুরুত্ব অপরিসীম, এও এক 'জীবনের ধন' যার 'কিছুই যাবে না ফেলা/ যতই ধুলায় তারে করো অবহেলা'।

# অকাদেমি পত্রিকা
# গত চারটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি

প্রথম সংখ্যা।। ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : অপূর্বানন্দ মজুমদার
১. শুভেচ্ছা বাণী : প্রভাস সেন মজুমদার।। ২. মুখবন্ধ : নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, বিজয়কুমার ধর।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. গবেষণার কথা : অসীমকুমার দত্ত।। ৫. বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা : জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য।। ৬. বরাক উপত্যকায় আর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : কয়েকটি অনালোচিত ও লোকায়ত তথ্যসূচি : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ৭. ভাটেরা তাম্রশাসন : সাহিত্য বিচার ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন : হরিপদ চক্রবর্তী।। ৮. সুলতানী আমলের একটি অনালোচিত লিপি : সুজিৎ চৌধুরী।। ৯. কাছাড়ে চা-শিল্পের আদিপর্ব : অপ্রকাশিত কয়েকটি সরকারী পত্র : দেবব্রত দত্ত।। ১০. বরাকের উপন্যাস ও অশ্রুমালিনী : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ১১. মননের প্রাকৃতায়ন : তপোশীর ভট্টাচার্য।। ১২. ইতিহাসের মৌন মুখর মুহূর্তগুলি কথা বলুক আজ: অনুরূপা বিশ্বাস।। ১৩. বরাক উপত্যকা ভিত্তিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, নিবন্ধ ও থিসিসসমূহের একটি প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ তালিকা : প্রশান্তরঞ্জন আচার্য।। ১৪. ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে গবেষণা পরিষদ আহ্বায়কের লিখিত প্রতিবেদন : অপূর্বানন্দ মজুমদার।।

দ্বিতীয় সংখ্যা।। ১৪১১ বঙ্গাব্দ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : জন্মজিৎ রায়
১. মুখবন্ধ : শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, তরুণ দাস।। ২. সম্পাদকের নিবেদন।। ৩. কাছাড়ের কয়েকটি অপ্রধান ভাষা : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ।। ৪. করিমগঞ্জে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ৫. সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম : তাম্রলিপির আলোকে : সুজিৎ চৌধুরী।। ৬. মনসামঙ্গল কাব্যের এক অনালোচিত কবি রাধামাধব দত্ত : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ৭. সুরমা-বরাক উপত্যকার স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত : আনন্দমোহন মহন্ত।। ৮. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি : শতবর্ষ পূর্বের চিঠিপত্রের আলোকে : জন্মজিৎ রায়।। ৯. শ্রীহট্ট-কাছাড়ে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে ঐক্যভাবনা : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১০. বরাক উপত্যকার কৃষি অর্থনীতি : নিরঞ্জন রায়।। ১১. আসামের বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক চিত্র : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা : পরিতোষচন্দ্র দত্ত।

তৃতীয় সংখ্যা।। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : জন্মজিৎ রায়
১. সম্পাদকীয়।। ২. Bipin Chandra Paul : The Fiery Orator and His struggle for Swaraj : হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।। ৩. Bipin Chandra Paul : A Chronicle of Life and

Events : ভূপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।। ৪. Bipin Chandra Paul : A Bibliography : বিজয় দেব।। ৫. কর্মে ও মননে বিপিনচন্দ্র ও গান্ধী : সন্দীপ দাস।। ৬. বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বিপিনচন্দ্র পাল : মায়া ভট্টাচার্য।। ৭. বিপিনচন্দ্র পাল : রাজনীতির মঞ্চে এক আপোষহীন ব্যক্তিত্ব : মনোলীনা নন্দী রায়।। ৮ : Speech on Congress Resolution for the Repeal of Assam Act (1887) : বিপিনচন্দ্র পাল।। ৯. প্রাণতুল্যেষু : বিপিনচন্দ্র পাল।। ১০. পিতাপুত্রে : বিপিনচন্দ্র পাল।। ১১. ত্যাজ্যপুত্র : বিপিনচন্দ্র পাল।।

# প্রসঙ্গ ভাষা আকাদেমি

বরাক উপত্যকার ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের স্বার্থে সম্মেলনের সূচনা থেকেই একটি বেসরকারি আকাদেমি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠেছিল। কী হবে এর সাংগঠনিক কাঠামো, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এর কর্মপদ্ধতি— এ নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। এরপর ১৯৮৭ সালে ২৭ এবং ২৮ জুন তারিখ হাইলাকান্দি টাউন হলে সম্মেলন আয়োজিত এক ‘বহুভাষিক কনভেনশন’-এর ৪ নম্বর প্রস্তাবে একটি ‘বহুভাষিক একাডেমি’ গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে বার বারই এসেছে এ প্রসঙ্গ, এবং সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে অপরিবর্তিত রেখে, বরাক উপত্যকা তথা আসাম রাজ্যের বহুভাষিক চরিত্রলক্ষণ বজায় রাখার প্রতি অঙ্গীকার রেখেই প্রস্তাবিত আকাদেমির আওতায় মূলত বাংলা ভাষা, সংস্কৃতিকেই ভিত্তিভূমি হিসেবে ধরে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়, এবং অপরাপর ভাষিকগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যথাযথ বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখার অঙ্গীকারও রাখা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির নামকরণে সামান্য পরিবর্তনও আনা হয়, ‘ভাষা আকাদেমি’। এই নামের মধ্যেই মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, সৃজনশীল সাহিত্য সমস্তকিছুই এসে যাবে— এরকম অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু নানা অসুবিধায় এ আকাদেমি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজগুলো হয়ে ওঠেনি। ১৯৯০-এর পরবর্তী দিনগুলোতে আকাদেমি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয় এবং ১৪ বৈশাখ, ১৪১৫ অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল, ২০০৮ সম্মেলনের অষ্টাবিংশতিতম সাধারণ সভা, রামকৃষ্ণনগর- এ গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে আকাদেমির একটি রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব সম্মেলনের তিনজন সদস্যের উপর দেওয়া হয়। ওই বছরই আবার সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় (৯ পৌষ, ১৪১৫, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৮, রবীন্দ্রভবন, হাইলাকান্দি) এ মর্মে আবার প্রস্তাব গৃহীত হয় (৪র্থ প্রস্তাব)। প্রাথমিক ভাবে আবুল হোসেন মজুমদার এবং সঞ্জীব দেবলস্করকে একটি খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের প্রস্তাবিত খসড়া রূপরেখা কেন্দ্রীয় সমিতির বিশেষ এক সভায় উপস্থাপন করা হয়, এবং প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ‘বরাক বাংলা আকাদেমি’ প্রতিষ্ঠার কথা জানালে সম্মেলনের ‘আকাদেমি’ প্রকল্প রূপায়নের উদ্যোগ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয় এ বিবেচনায় যে, একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এ ধরনের আকাদেমি এ উপত্যকার পক্ষে যথেষ্টই হবে, এবং সম্মেলন বাইরের থেকে সহায়তা করলেই এতে নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ন ঘটবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাদেমি তেমনি ভাবে আত্মপ্রকাশ না করায় সম্মেলন নিজস্ব আকাদেমি প্রতিষ্ঠার সাবেক প্রস্তাবে ফিরে আসে, এবং এ মর্মে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

## ১৪ বৈশাখ, ১৪১৫, অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল, ২০০৮ সম্মেলনের অষ্টাবিংশতিতম সাধারণ সভা, রামকৃষ্ণনগরে গৃহীত মূল প্রস্তাবটির বয়ান নিম্নরূপ :

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন দীর্ঘদিন যাবৎ এই উপত্যকার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে

গবেষণা ও বিস্তৃত চর্চার জন্য একটি বাংলা আকাদেমি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও বহু চর্চাও হয়েছে। নব্বই-এর দশকে এই প্রস্তাবিত আকাদেমির রূপরেখা রচনার দায়িত্বও সম্মেলনের তিনজন সদস্যের উপর দেওয়া হয় এবং এর একটি রূপরেখাও তৈরি হয়।

পরবর্তীককালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সম্মেলন এই দায়িত্ব আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করে। কিন্তু আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ ধরনের আকাদেমি গঠনের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে সম্মেলনের কার্যনির্বাহক সমিতির এই সভা সম্মেলনের নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তাবিত আকাদেমি গঠনের প্রস্তাবটির পুনরায় গ্রহণ করছে। আগামী জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির দ্বারা আয়োজিত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দেড়শত বর্ষপূর্তির স্মারক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বের সভায় এই প্রস্তাবিত বাংলা আকাদেমির আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং সেই সঙ্গে অদ্যকার এই সভা আকাদেমি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি তদর্থ (অ্যাড হক) সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। সদস্যরা হলেন : (১) সুবীর কর, (২) জন্মজিৎ রায় (৩) সৌরিন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (৪) আবুল হোসেন মজুমদার (৫) সঞ্জীব দেবলস্কর (৬) নীতিশ ভট্টাচার্য (৭) সম্মেলনের তিন জেলা সমিতির সভাপতি, সম্পাদকগণ। এই সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এই সমিতির সদস্য থাকবেন এবং সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক এই সমিতির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

এ প্রসঙ্গে এটাও স্মরণ করা প্রয়োজন, ১৪১৬ সালে ১২ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল, ২০০৯, শিলচর বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য নির্বাহী সভার গৃহীত চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, '২০০৮ সালের ২৬ জানুয়ারি সম্মেলনের উদ্যোগে যে বাংলা আকাদেমি গঠিত হয়েছে বর্তমান বছর অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে গবেষণা পর্ষদ বাংলা আকাদেমির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসেবে কার্য নির্বাহ করবে'।

আকাদেমির প্রস্তাবিত খসড়ার একটি ধারায় আছে (কর্মপদ্ধতি-৪) : 'গবেষণা পর্ষদ পত্রিকাই আকাদেমি পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হবে। গবেষণা পর্ষদের আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকবে না। মুদ্রণ, প্রকাশনা বিভাগের সহ-সচিবের উপর পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব থাকবে।' এ মর্মেই বর্তমান গবেষণা পর্ষদের আহ্বায়ককে এবারের পত্রিকাটি পূর্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই 'আকাদেমি পত্রিকা' হিসেবে প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২০০৯ সালের ২৬ জানুয়ারি করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের স্মরণে অনুষ্ঠিত বহুপ্রতীক্ষিত আকাদেমি বিষয়ে প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেই এবারের এই 'আকাদেমি পত্রিকা' প্রকাশ।

আশা করা হচ্ছে আকাদেমির প্রস্তাবিত রূপরেখার খসড়া নিয়ে চিন্তা চর্চা হবে এবং ভাষা আকাদেমি অচিরেই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার পথে এগিয়ে যাবে। এ পত্রিকা প্রকাশনা যে আকাদেমি প্রস্তাব বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এ আমাদের বিশ্বাস।

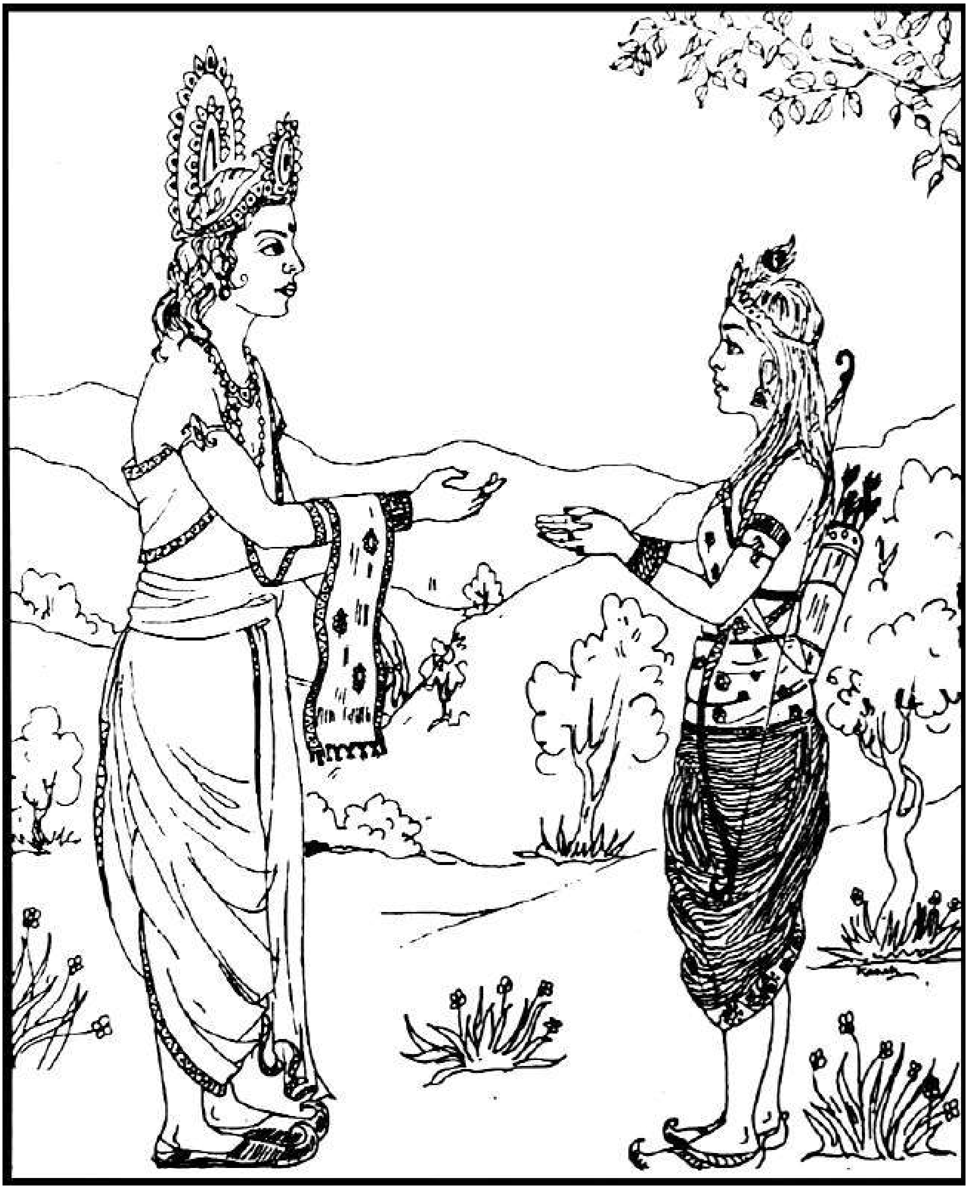

“মণিপুর রাজকন্যা কান্তহৃদয়বিজয়ে হবে ধন্যা'।।

মণিপুরনৃপদুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে পঞ্চশ্বরের বরদান

চিত্রাঙ্গদা নৃত্য নাটিকার একটি দৃশ্যকে চিত্রায়িত করেন কনককান্তি সিনহা

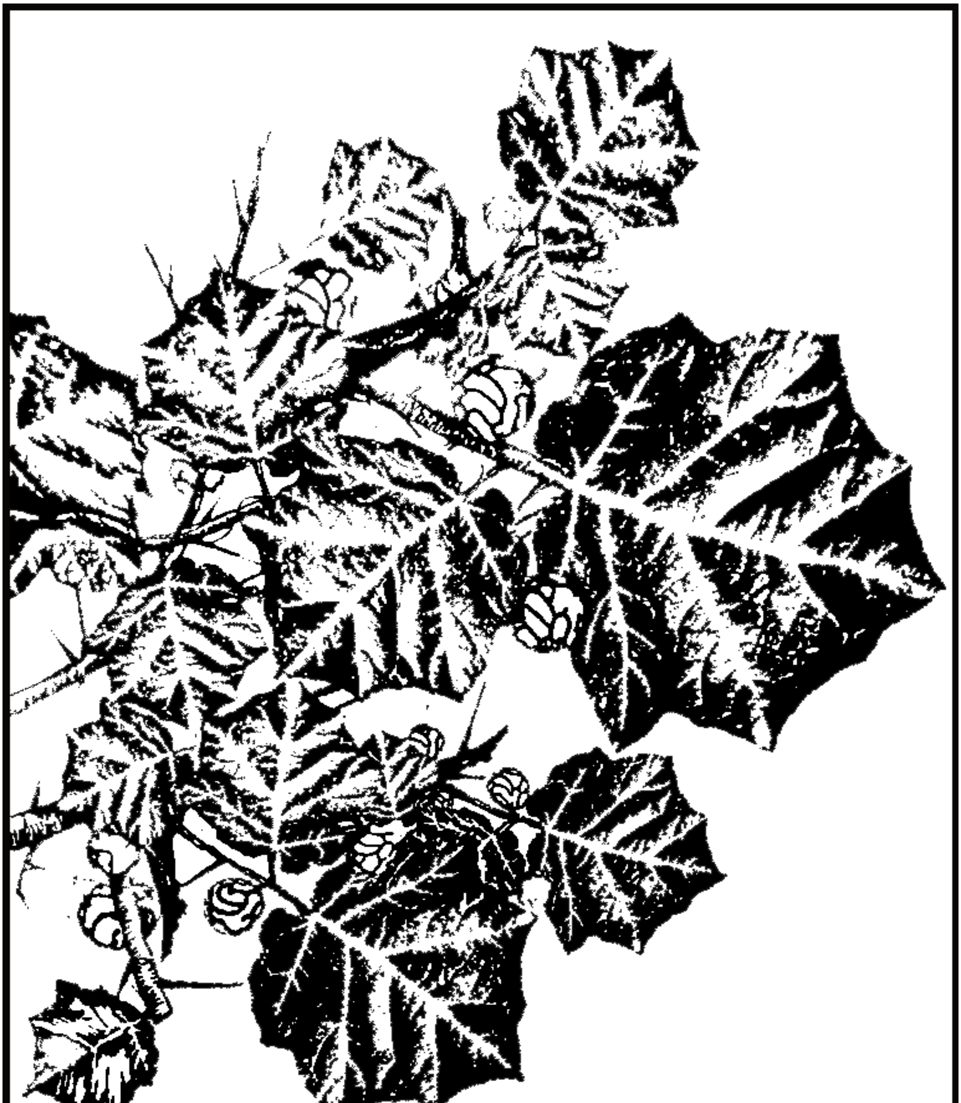

'... হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কন্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।'

রবীন্দ্রকাব্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্রাত্য গুল্ম কন্টিকারির চিত্রটি এঁকেছেন নির্মলকান্তি রায়।

# লেখক পরিচিতিঃ

**ড০ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য** : এ সময়ের অন্যতম রবীন্দ্রগবেষক আসাম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র অনুষঙ্গ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। অসমিয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এবং আসাম, আর বাংলায় 'নীল সোনালির বাণী : রবীন্দ্র অসম সম্পর্ক' (২০১০) তাঁর বহু প্রশংসিত কর্ম। এ সঙ্গে বরাক তথা শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এ সময়ের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রাজ্ঞজনের অন্যতম এ লেখক।

**ড০ বাণীপ্রসন্ন মিশ্র** : বহু বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য, চিন্তা ও কর্মকে এক করে নিবিষ্ট চিত্তে নিরলস অনুধ্যানে রত এ লেখক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ মুহূর্তে বিদ্যাচর্চার জগতে একজন দিশারী। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব এবং আন্তঃ সামাজিক দ্বন্দ্ব, ভাষা সমস্যা কিংবা সাহিত্য — বিচিত্র বিষয়ে লিখন পঠন এবং আলোচনায় ব্যস্ত এ লেখকের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'উন্মোচিত ঢাকাদক্ষিণ : ঠাকুরবাড়ির খণ্ডচিত্র' (২০১১)।

**আবুল হোসেন** : গবেষক প্রাবন্ধিক। সমাজ-ধর্ম-বৈষ্ণবতত্ত্ব-সুফিতত্ত্ব এবং ইসলামীয় দর্শনে বিশেষ পারদর্শী এ লেখকের ইংরেজি ও বাংলা মূল্যবান অসংখ্য নিবন্ধ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রশংসিত। বরাক উপত্যকার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সমাজ তাঁর অধ্যয়নের বিশেষ ক্ষেত্র।

**ড০ জন্মজিৎ রায়** : কবি-গবেষক এ লেখকের চর্চার ক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত। ইতিহাস থেকে ভাষাতত্ত্ব, বাংলা বানান সমস্যা থেকে সাহিত্যতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব থেকে কবিতা, সর্বত্রই তাঁর বিচরণ। প্রকাশিত গ্রন্থ — অন্দর থেকে বারান্দা (১৯৭২) মগ্ন ভগ্ন কণ্ঠস্বর (১৯৯৪), সময়ের হৃদপিণ্ড (২০১০), সার্ধশতকের বরাক উপত্যকার সাহিত্য ও সমাজ, জীবনানন্দের কাব্যপাঠের ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসূত্র (২০০৪), Theory of Avatara and Divinity of Chaitanya (2002)।

**ড০ আনন্দ মোহন্ত** : সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এ লেখকের অধিতব্য বিষয় সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, থেকে ধর্মতত্ত্ব, ধ্রুপদী সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং বাস্তুশাস্ত্র। গুরুগম্ভীর বিষয়কে সর্বজনগ্রাহ্য রাজ্যভাষায় পরিবেশন করতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য রচনা এখনও সংকলনের অপেক্ষায়।

**ডঃ মনুজেন্দ্র শ্যাম** : পেশায় চিকিৎসক এ লেখক রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রবল অনুরাগী। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রবীন্দ্র অনুরাগ তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে তিনি নিবন্ধ লেখেন, বক্তৃতাও করেন। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের উপর তাঁর একটি মননশীল গ্রন্থও রয়েছে।

**সঞ্জীব দেবলস্কর** : প্রাবন্ধিক-গবেষক। ইতিহাস, সমাজ, ভাষা, সংগীত, লোকসংস্কৃতি ও শিক্ষা তাঁর অধিতব্য বিষয়। প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী করে লিখব (১৯৯৯), যতীন্দ্রমোহন এবং গ্রাম কাছাড়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি (২০০২), আজকের শ্রোতার বাংলা গান (২০০৬), বরাক উপত্যকার ইতিহাস ও সমাজ (২০১১), Portends of Disaster : Challenges before the Linguistic Minorities in Assam (2011); সম্পাদিত গ্রন্থ, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ রচিত ‘কাছাড়ের ইতিবৃত্ত’ (২০০৬), প্রেমেন্দ্র গোস্বামীর স্মৃতিগ্রন্থ স্মরণে ও শ্রদ্ধায় (২০০৭), তাছাড়া আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক।

**তুষারকান্তি নাথ** : কবি ও গবেষক। লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, নাথপন্থ বিষয়ক গ্রন্থ ও নিবন্ধের রচয়িতা এ লেখক সাহিত্য, আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির একজন অন্যতম গবেষক ও সংগ্রাহক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম গঙ্গারিডি : ঐতিহ্যের অনুসন্ধান (২০০৩), উনিশে মে : চেতনার নির্যাস (২০০৪), ডিমাসা সংস্কৃতির আভা (২০০৬), কবিতার বই, ইচ্ছের কুঁড়ি (১৯৮৯)। লেখক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ‘জতিঙ্গা’র সম্পাদক।

**বিবেকানন্দ মহন্ত** : পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এ লেখক বরাক উপত্যকার ইতিহাস বিষয়ক একাধিক মৌলিক নিবন্ধ রচনা করেছেন। বরাক উপত্যকার ভূ-প্রকৃতি, ঔপনিবেশিক পর্বে শ্রমিক আন্দোলন, বৈরী সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়েও তিনি নিবন্ধ লিখেছেন। চরগোলা এগজডাস নিয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।

**দেবাশিস দাস** : রবীন্দ্র সংগীতে পারদর্শী এ লেখক রবীন্দ্র চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বরাক উপত্যকার সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঔপনিবেশিক আমলের সমাজ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁর মূল্যবান নিবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং স্মারকগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

**অরিজিৎ চৌধুরী** : তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে কর্ম অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় একজন সৃজনশীল কথাকার হিসেবেই। বরাক উপত্যকার প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম এ লেখকের গল্প উপত্যকার ভেতরে এবং বাইরে বহু পঠিত এবং প্রশংসিত। মিজোরামের পটভূমিকায় তাঁর ‘পু

ঘোষ’ একটি উল্লেখযোগ্য গল্প।

**দীপঙ্কর চন্দ** : মূলত নাট্য পরিচালক এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাত এ লেখকের মননশীল প্রবন্ধ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধুনা অপ্রকাশিত সাময়িকী ‘খ’ পত্রিকার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

**নির্মলকান্তি রায়** : শিল্প শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এ শিল্পী রিয়েলিস্টিক পেন্টিং-এর সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল আর্ট বা নিউ মিডিয়া আর্ট নিয়ে চর্চায় রত। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রচ্ছদও এঁকেছেন।

**কনককান্তি সিনহা** : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্টস-এর ছাত্র।